জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১

ট্রান্স-[পোস্ট]-হিউম্যানিজম : স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের পটভূমিতে

সেলিম মোজাহার*

Abstract

Theories of Transhumanism and Posthumanism are assumed to have been grown with the same goal and purpose of philosophic and social movement. With a view to exploring the future potentialities of mankind and their sophisticated technologies both of the concepts continues to be strongly discussed in arena of contemporary Theology, Philosophy, Human-science, Ethics, State and Politics, Cultural Anthropology, Medical Science, Psychiatry, Neuroscience, Biology, Evolutionary Biology, Micro-biology, Genetic Science, Computer Science, Nano Technology, Information Science, as well as in, Artificial Inteligence and in many respective fields as a Futurist Philosophy. This robust growth of transhumanism is [World]-widely portrayed in science fiction novels and films for more than a hundred years. Nowadays, it is being considered as the most vital philosophical discourse in the context of Fourth Industrial Revolution era. In the meantime, a large number of scientists, researchers, theorists, philosophers and writers have developed a vast body of knowledge on the definitions, concepts, possibilities, applications and effects of these concepts and theories. Academies in the west including MIT, Harvard, Cambridge, and Oxford, and various institutions outside the academies have made huge investments [from public-private sources] in the research and theoretical development of this Neo-human Philosophy. It is to be noted that no [serious] observation, reading, discussion, research and practice has been initiated in this regard at the academic or non- academia in Bangladesh and the South Asian region. With this in mind, this article attempts to present a critical perspective of the theoretical history and fundamental ideas of trans-[post]-humanism with evaluative judgment and will investigate, why, where and how it is important for a nation-state like Bangladesh.

ট্রান্সহিউম্যানিজম [Transhumanism] ও পোস্টহিউম্যানিজম [Posthumanism] ধারণা দুটি আমাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক পর্যায়ে এখনও তেমন পরিচিত না। পশ্চিমে এ-তত্ত্বদর্শনের চর্চা ও গবেষণা চার দশকেরও বেশি সময়ের। যদিও আমরা জানি, ইয়োরোপীয় সংস্কারবাদী আন্দোলন তথা রেনেসাঁ বা নবজাগরণের ঢেউ ভারতবর্ষে পৌঁছাতে তিনশ বছর লেগে গিয়েছিল— বর্তমান বাংলাদেশে তা আরও একশ বছর পর— তা-ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ হয়ে। সে-তুলনায়, চার দশক খুব বেশি কিছু না। তবে,আমরা এ-ও জানি, সেটা ছিল জাহাজবাহী বিশ্বযোগাযোগের কাল মাত্র। আমরা বাস করছি এখন বিশ্বছড়ানো তাৎক্ষণিক, বৈদ্যুতিক [Digital] যোগাযোগ-সংস্কৃতির বাসিন্দা হিসেবে। এখানে স্থানকাল নিউটন-আইন্সটাইন-এর বলবিদ্যা মেনে একবিন্দুতে গাঁথা। এ-হিসেবে, চারদশক বিপুল এক সময়। সমকালীন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকালের সবচেয়ে জরুরি ডিসকোর্স ও প্রয়োগবিদ্যা হিসেবে 'ট্রান্স-[পোস্ট]-হিউম্যানিজম' বিষয়ে আমাদের সজাগ না হয়ে উপায় নাই। এ-বিষয়ে সম্মিলিত [Wide] জ্ঞানগত উপেক্ষা একটি আকস্মিক বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে ফেলতে যাচ্ছে কি-না আমাদের, সেটাও প্রশ্ন। যদি তেমন হয়, সে-সম্ভাব্যঝুঁকি ও বিপর্যয়ের চেহারা

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

কেমন, তা খুঁজে দেখা জরুরি। খুঁজে দেখা জরুরি, তেমন বাস্তবতার সামনে আমাদের জন্যে কী-কী পথ খোলা আছে বলে ভাবছেন সমকালীন দার্শনিক-বিজ্ঞানীগণ।

ট্রান্স-[পোস্ট]-হিউম্যানিজম-এর ঐতিহাসিক ধারণা, বিকশিত তত্ত্বদর্শন ও সমকালীন প্রয়োগচর্চা আলোচনাসূত্রে প্রশ্নটার গুরুত্ব যাচাই এনিবন্ধের মূল প্রস্তাবনা। এ-নতুন ‘মানব তত্ত্বদর্শন’-এর পরিভাষা, সংজ্ঞা, ধারণাগত ইতিহাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মতাদর্শিক ভাগ-বিভাজন, প্রকৃত বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা– এসব কিছুর পটভূমিতে, উপরে তোলা প্রশ্নটির মুখোমুখি হওয়া যেতে পারে।

লাতিন ‘ট্রান্স’ উপসর্গসূত্রে ‘ট্রান্সহিউম্যানিজম’ দিয়ে বোঝানো যেতে পারেঃ মানবতাবাদ অতিক্রান্ত বা মানবতাবাদকে ছাড়িয়ে বাপার হয়ে। এ-অর্থে, ট্রান্সহিউম্যানিজম-এর বাংলা পরিভাষা হতে পারে, উত্তর-মানবতাবাদ বা মানবোত্তরবাদ। তবে, ট্রান্সহিউম্যানিজম ডিসকোর্সে আরেকটি সহোদর মানবভাবনা হিসেবে ‘পোস্টহিউম্যানিজম’ প্রত্যয়টিও প্রায় সমান ব্যবহৃত হয়ে চলেছে এরই মধ্যে। যাকে ‘উত্তর-মানবতাবাদ’ হিসেবে সরাসরি গ্রহণ করা সহজ। এদিকে দুটি ধারণাদর্শনেরই জন্ম প্রায় একই অন্বেষার উৎসে বা মূলে। ধারণা-দুটি এমন এক মানবধারণা প্রস্তাব করে, যা বর্তমান মানবধারণা উত্তরিত বা পার হওয়া। দর্শন হিসেবে এটি মনে করে, ‘ভৌত-জগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও উন্নত প্রাণী হিসেবে, মানুষ যদি তার বিবর্তনের ধারাবাহিকতা, অগ্রগতিও টিকে থাকাকে ধরে রাখতে চায়, তাহলে তার নিজের শারীরিক-মানসিক সত্তাকে নতুন রূপে, নতুন করে গড়ে নিতে হবে – তার নিজের আবিষ্কার করা বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক জ্ঞান-প্রকৌশল কাজে লাগিয়ে।’[১] প্রয়োগকলার দিক থেকে, এ-তত্ত্বদর্শনের প্রথম ধাপ ট্রান্সহিউম্যানিজম; যেখানে এক জৈবযান্ত্রিক-মানবসত্তা [Biotech Human Being] হিসেবে মানুষের রূপ ও ক্ষমতাকে দেখা হয়। এর পরের ধাপ পোস্টহিউম্যানিজম, যেখানে জৈবযান্ত্রিক মানুষেরাও আর থাকবে না, মানবীয় বুদ্ধিমত্তা টিকে থাকবে কিছু অতি-ক্ষমতাবান ব্যক্তিমানুষ-নিয়ন্ত্রিত [Private] অতি-উন্নত [Super Inteligent] যান্ত্রিক-বুদ্ধিমত্তা বা সচেতনতা [Mashine Consciousness] হয়ে[২] –একটু কঠিন বাংলা পরিভাষায় যাকে বলা যেতে পারে ‘প্রাকৌশলিক-এককত্ব’ [Technological Singularity]। হলিউডি ভবিষ্যবাদী তথা ফিউচারিস্ট বৈজ্ঞানিক কল্পকথা [Science Fiction] জাতের [Genre] চিত্রপরিভাষায় যাকে বলা হয় ‘দ্য ওয়ান’।

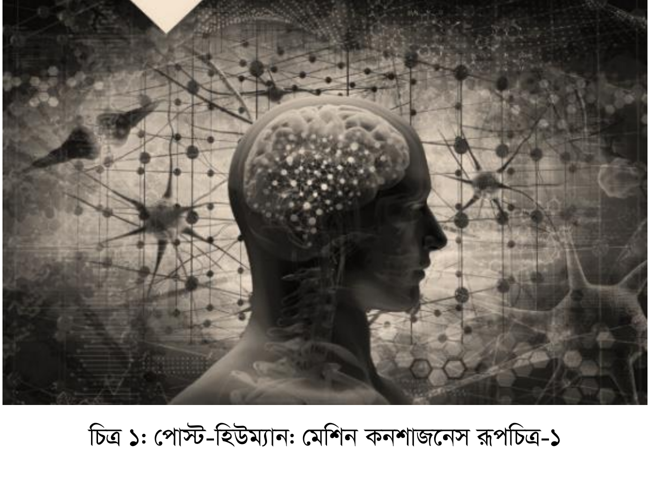

চিত্র ১: পোস্ট-হিউম্যান: মেশিন কনশাজনেস রূপচিত্র-১

উপরের প্রস্তাবনা থেকে বোঝা যায়, ট্রান্স-[পোস্ট]-হিউম্যানিজম তত্ত্বদর্শনের জন্ম, মানুষের অস্তিত্ব ও টিকে থাকার প্রশ্নে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক ইতিহাস পাঠ করে, মানুষ এরই মধ্যে জেনেছে যে, পৃথিবীতে বিকশিত প্রাণ-প্রজাতিরা এর আগে আরও পাঁচটি মহাবিলুপ্তির [Mass Exitinction] কবলে পড়েছিল। বর্তমান 'দুই পা-ধারী স্তৈন্য' [Bipedal Mamal] প্রজাতির যুগে পৃথিবীর প্রাণ-প্রজাতি আবারও একটি মহাবিলুপ্তির [Sixth Mass Extinction] দরোজায় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞগণ। বৈশ্বিক-উষ্ণতা, জলবায়ুর পরিবর্তন, বিশ্বব্যাপ্ত [Pandemic] মহামারি-অতিমারি, অতি-জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক-সাম্য বিনাশ ও বিপর্যয়, প্রাকৃতিক সম্পদের ফুরিয়ে আসা, মহাজাগতিক শক্তিসাম্যের পরিবর্তন বা মহাকর্ষ বলের পরিবর্তন, মহাজাগতিক বস্তুপিণ্ডের পতন এবং পারমাণবিক যুদ্ধ – ইত্যাদি যে-কোনো একটি প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কারণে মানবতা খুব সম্ভব আরেকটি [ষষ্ঠ] মহাবিপর্যয়ের কবলে পড়তে যাচ্ছে।[৩] আর তা, আগামী ৫০ কি একশ বছরের মধ্যে। এর আগের প্রতিটি মহাবিলুপ্তির ঘটনায় পৃথিবীর পুরো প্রাণ-প্রজাতির ৭০ থেকে ৮৫ ভাগ পর্যন্ত বিলুপ্ত হবার নজির আছে। ডাইনোসরের মতো কোনো-কোনো প্রজাতির ক্ষেত্রে ওটা ছিল শতভাগ। সম্ভাব্য বা আসন্ন তেমন এক মহাবিনাশের কবল থেকে, প্রমাণযোগ্যভাবে, গত এক লাখ বছরেরও বেশি বয়সের বিকশিত মানবপ্রজাতি, মানবসভ্যতা, মানবচিন্তা, মানব-অর্জনকে রক্ষা করা মানুষের মানবিক দায় বলে মনে করেন ট্রান্সহিউম্যানিস্টরা। আর তার জন্যে, মানুষকে তার আবিষ্কৃত বিজ্ঞান-প্রকৌশলেরই আশ্রয় নিতে হবে বলেও মনে করেন তারা। কারণ, প্রকৃত অর্থে,মানব-সভ্যতাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের সমান্তরাল হিসেবেই দেখেন তারা। তাদের সোজাসাপ্টা মত, 'মানব-সভ্যতার বর্তমান অগ্রগতিতে কোনো ছেদ তৈরি হতে না দিয়ে,আসন্ন বিপর্যয়কাল পার হবার জন্যে, মানুষকে নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সভ্যতা গ্রহণ করতে হবে।'[৪] এ-সভ্যতা, গণিত বা অ্যালগরিদম-নির্ভর যান্ত্রিক-বৈদ্যুতিক সভ্যতা। এ-সভ্যতা, চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবকালের মানবধারণা ঘোষণা করেঃ যেখানে, 'প্রযুক্তি-সহগামী মানুষেরা হবে বর্তমান মানুষের তুলনায় প্রায় দানবীয় ক্ষমতার।'[৫]

এ-সূত্রে ট্রান্স-[পোস্ট]-হিউম্যানিজম একটি উত্তর-মানবতাবাদী ধারণা-দর্শন। যেখানে, প্রথমবারের মতো, পৃথিবীতে বাস করা মানব নামের প্রজাতিটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণভার তুলে দিতে চলেছে দানবীয় ক্ষমতার যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তার হাতে। এটি মানব ইতিহাসের ক্ষমতা-ধারণায় অন্যতম কাঠামোগত [Structural] পরিবর্তন। তবে, অন্যত মহলেও, এ-বদল একই সাথে অনন্যও। এ-কারণে যে, মানবীয় ক্ষমতা থেকে যান্ত্রিক ক্ষমতার কাছে নিজেদের আত্ম-হস্তান্তরের ঘটনা এটি[৬]– যা মানুষের ইতিহাসে বা সভ্যতায় প্রথমবারের মতো ঘটতে চলেছে। দার্শনিক ভাষায় যাকে বলা হচ্ছে মহাবদল [Grand Shift]। এর ইতি-নেতি নিয়ে এরই মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাকেন্দ্র [School of Thoughts] গড়ে উঠেছে। তবে, মোদ্দা কথাটা হলো, ট্রান্স-[পোস্ট]-হিউম্যান তত্ত্বদর্শনের নির্মাতারা মানুষকে তার বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক-সাংস্কৃতিক আবদ্ধতায় দেখতে চান না আর। এরা মনে করেন, 'বসতের ঠিকানা হিসেবে এ-পৃথিবীর, এমনকি সৌরজগতের বাইরে তাকাবারও সুযোগ আছে মানুষের।' তাদের মতে, 'পৌরাণিক পরকাল পৌরাণিক প্রভুর হাতে নাই'; তবে মানুষ চাইলেই পারে, 'ইহকালটাকে দীর্ঘতম করে তুলতে – এমনকি নিজেকে অমর [!]'। প্রাযুক্তিক জ্ঞানের হাত ধরে মানুষ আজ বিকাশের এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে; 'এখন সে চাইলেই পারে, প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নিজের শারীরিক ও বৌদ্ধিক ক্ষমতাকে তুরীয় [Transcendental] করে নিতে।'[৭] কথাটা হলো, এ-নয়া-মানবদর্শন, মানুষকে 'মানুষ আর

প্রযুক্তি’ এ-দুটি ভিন্নসত্তা [Separate Entity] থেকে ‘প্রযুক্তি মানুষ’ [Humanoid] নামের এক যৌথসত্তায় [Combind Entity] রূপান্তরের রূপকল্প বা এজেন্ডা নিয়ে তৎপর। পদ্ধতিগতভাবে ধারণাটিকে বলা হচ্ছে ‘এনবিআইসি মেথড’ [NBIC Method]। অর্থাৎ, ন্যানোটেকনোলজি বা অতিক্ষুদ্র-প্রকৌশল, বায়োটেকনোলজি বা জৈব-প্রকৌশল, ইনফরমেশন সাইন্স বা তথ্যবিজ্ঞান এবং কগনিটিভ-সাইন্স তথা জ্ঞান-প্রকৌশল– এ-চার মৌলিক জ্ঞানের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে আগামীর ট্রান্স বা পোস্ট-হিউম্যান। ট্রান্স ও পোস্ট মানবতার তত্ত্ব-নির্মাতাদের মতে, মানব-পরিচয়ের এক মহাবদলের দ্বারপ্রান্তে এসে গেছে মানুষ। পুরোনো মানবধারণার পরিবর্তন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ইতিমধ্যে [বানানটি নির্বাচিত] সে-পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার ভিতর প্রবেশ করে গেছে পৃথিবীর বাসিন্দারা। এ-তত্ত্বের অতি-আশাবাদী কোনো-কোনো তাত্ত্বিকের মতে, আগামী ‘২০৪৫-এর মধ্যে এন্ড্রয়েড-হিউম্যান [Humanoid]-এর আগমন অবশ্যম্ভাবী।’[৮] এদের চিন্তায়, ‘বাইবেল বলে, ঈশ্বর নিজের প্রতিরূপে মানুষ গড়েছে; ফয়েরবাখ বলেন, মানুষ নিজেদের প্রতিরূপে ঈশ্বর গড়েছে – আর ট্রানসহিউম্যানিস্টরা বলে, মানুষ এবার নিজেদেরই ঈশ্বর করে তুলতে চলেছে।’[৯]

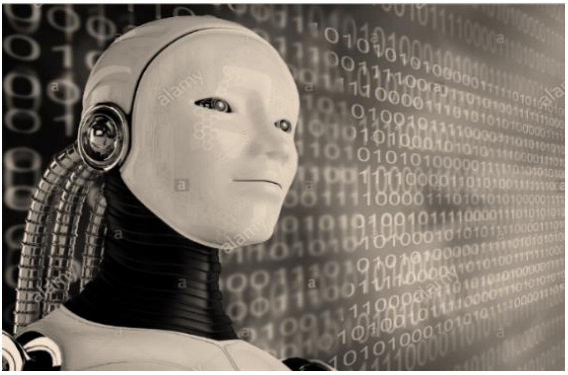

চিত্র ২: পোস্ট-হিউম্যান: মেশিন কনশাজনেস রূপচিত্র-২

ট্রান্সহিউম্যান চিন্তাচেতনার উৎস বা মূল খুঁজতে গিয়ে, ট্রান্সহিউম্যানিস্ট নিক বস্ট্রম [১৯৭৩] একে নিয়ে যান খ্রিস্টপূর্ব সতেরো শতকেরও আগে। পারস্য মহাকাব্য ‘গিলগামেশ’-এর নায়ক জানাচ্ছে, ‘সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে, সে একটা উদ্ভিদ তুলে আনছিল, যা খেলে অমরত্ব পাওয়া যেতো; কিন্তু মাঝপথে একটা সাপ তার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে, সে-উদ্ভিদটা খেয়ে ফেলে।’ এরপর,‘আলকেমি যুগের জাদুরস [Magic Elixir] অন্বেষা, চীনা তাও মতপন্থী [Tao-ism or Dao-ism] নানা সাধকচক্রের সাধনকলা – প্রাকৃতিক আদ্যশক্তিকে আয়ত্ত করে দৈহিক অমরতা লাভের চেষ্টাগুলো’র কথা তুলে ধরেন তিনি।[১০] এ-পটভূমে ধারণাটি মরণশীল মানুষের অমর হবার বাসনার সাথে যুক্ত হিসেবেই পাওয়া যায়। গ্রিক পুরাণের প্রমিথিউস ও ডিডেলাসও আসে – যে-দুটি চরিত্র মানুষকে উন্নতজীবনের কৌশল শেখাতে গিয়ে দেব-দেবীদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল।[১১] ট্রান্সহিউম্যান ধারণায়-দর্শনে আসে পরম আইডিয়ালিস্ট প্লেটোর নামও। মানুষকে মানবীয় সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে, ঈশ্বরের মতো নিখুঁত [Ideal] হিসেবে প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি। প্লেটোর আদর্শ মানব ব্যবহার করে খ্রিস্টীয় যাজকরা ঈশ্বর অনুগত দাস-মানবাদর্শ গড়ে তোলে মধ্যযুগের ইয়োরোপে। তারপর, রোমান ভিট্রুভিয়াসের জ্যামিতিক-গাণিতিক মানব-নকশার

অনুকরণে, রেনেসাঁর তুঙ্গকালে, পশ্চিমা নবজাগরণের আঁতুড়ঘর ইতালির ভেনিসে বসে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি [১৪৫২-১৫১৯] আঁকেন তাঁর প্রখ্যাত 'ভিট্রুভিয়ান ম্যান' [Vitruvian Man]।

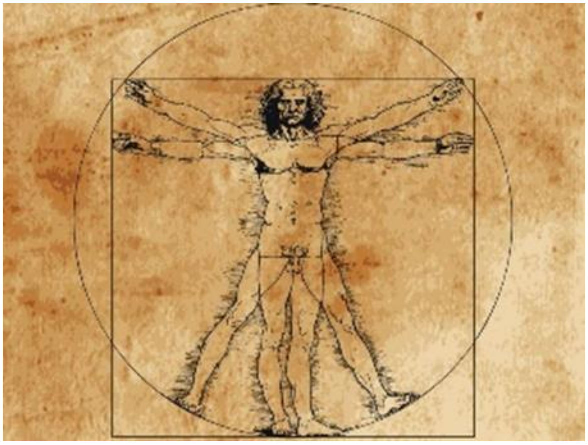

চিত্র ৩: ভিট্রুভিয়ান ম্যান, ১৪৮৫, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, ভেনিস, ইতালি

যাতে, মানুষের দেহকাঠামোয় নিখুঁত হবার মতো গাণিতিক-জ্যামিতিক সঙ্গতি দেখানো হয় – মেপে দেখানো হয় 'সোনালি-অনুপাত' [Golden Ratio:1.618]। দেবোপম নিখুঁত হবার প্লেটোনিক এ-মানব-বাসনাটিও ট্রান্সহিউম্যানিস্টদের কাছে অনুপ্রেরণার।[১২] তবে, খ্রিস্টীয় অন্ধকার ইয়োরোপে, সক্রেটিসের আগের প্রকৃতিবাদী দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের[১৩] জ্ঞান-মনীষার আবিষ্কারে ও জাগরণে, নতুন মানবভাবনার সূচনা হয় খ্রিস্টাব্দ ষোল শতকের শুরু থেকে। নিকোলাস কোপার্নিকাস [১৪৭৩-১৫৪৩], গ্যালিলিও গ্যালিলি [১৫৬৪-১৬৪২], জোহান ক্যাপ্লার [১৫৭১-১৬৩০] – এ-তিন মহারথীর সূর্যকেন্দ্রিক [Haleocentric] বিশ্বধারণার প্রমাণপত্র ঈশ্বর-হারানো মানুষদের নিজেদেরই ঈশ্বর ভাবার পথ দেখায় বলে মনে করেন ট্রান্সহিউম্যানিস্টরা। তারপরও, ট্রান্সহিউম্যানিস্টদের কাছে সবচেয়ে উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ [১৮৫৯]।'মানবত্ব ঈশ্বরের ইচ্ছার ফল বা কৃপা নয় – যুক্তি, বুদ্ধি, ভাষা, শিল্প,শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান,প্রযুক্তি, প্রকৌশল, আবিষ্কার, উদ্ভাবন, প্রয়োগ-এর মধ্যে মানবত্ব। এ-মানব-ধারণায় মানুষ ঐশ্বরিক নয়, স্বর্গীয় নয়; প্রাকৃতিক– কিন্তু তারা জানা প্রকৃতিতে অনন্য।'[১৪]

রেনেসাঁর বিজ্ঞাননির্ভর এ দেখন-দর্শন, যা মানুষকে দেখে, সম্ভাবনার অনন্ত আধার [Infinite Resorvoir of Possibilties] হিসেবে— ট্রান্সহিউম্যানিস্টদের মৌলিক ধারণা-দর্শন; যেখানে মানবত্ব ছাড়িয়ে যাওয়া মানুষের এক অতিমানবিক রূপ ও সম্ভাবনাকে কল্পনা করা হয়। জার্মান মনীষী নিটশে [১৮৪৪-১৯০০] তাঁর প্রখ্যাত 'ওভারম্যান' [Ubermensch] তত্ত্বে মানুষকে অমনই এক ওভারম্যান বা সুপারম্যান হিসেবে কল্পনা করেন, যারা আধুনিক মানবসাধ্যের সীমা ছাড়ানো। নিরীশ্বর নিটশেও তাই ট্রান্সহিউমেনিস্ট তত্ত্বাদর্শে জায়গা করে নেন।[১৫] এরপর, জে. বি. এস. হ্যালডেন [১৮৯২-১৯৬৪]-এর *পজিবল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আদার এসেজ* [১৯২৭], *ডিডেলাস, অর, সাইন্স অ্যান্ড দ্য ফিউচার* [১৯৩৫] এবং জে. ডি. বারনাল [১৯০১-১৯৭১]-এর *দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য ফ্লেশ, অ্যান্ড দ্য ডেবিল: এন এনকোয়ারি ইনটু দ্য ফিউচার অব দ্য থ্রি এনিমিজ অব দ্য র‍্যাশনাল সোল*

[১৯২৯]-সহ বেশ কিছু রচনা ট্রান্সহিউম্যানিস্ট মানববিশ্বের ছবিটিকে স্পষ্ট করতে শুরু করে। তবে, পশ্চিমা জ্ঞানজগতে 'ট্রান্সহিউম্যান' পরিভাষাটি প্রথম সরাসরি ব্যবহার করেন সোরেল জুলিয়ান হাক্সলি [১৮৮৭-১৯৭৫]। ১৯৫৭ সালে কপিরাইট করা তাঁর *ট্রান্সহিউম্যান* শিরোনামের রচনায় বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি তোলেন তিনি। জুলিয়ান হাক্সলির বিশেষায়িত পরিচয় : প্রখ্যাত বৃটিশ জীববিজ্ঞানী টি. এইচ হাক্সলির [১৮২৫-১৮৯৫] দৌহিত্র এবং প্রখ্যাত বৃটিশ সাহিত্যিক ও দার্শনিক, *আ ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড* [১৯৩২]-এর রচয়িতা অলডাস হাক্সলির [১৮৯৪-১৯৬৫] সহোদর। নামজাদা বৃটিশ হাক্সলি পরিবারের নামজাদা সদস্য, বৃটিশ ইউজেনিক্স সোসাইটির সভাপতি, বিবর্তনতাত্ত্বিক জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলি 'আধুনিক বিজ্ঞান-প্রকৌশলব্যবহার করে, উন্নততর এক মানব-প্রজাতির সম্ভাবনা'[১৬] দেখান ওই রচনায়। ট্রান্সহিউম্যানিস্ট তত্ত্বে-ধারণায় জুলিয়ান হাক্সলিকে তাই মান্যদিশারি মানতে দেখা গেছে। তবে, শ্বেত-শ্রেষ্ঠত্বের পতাকাবাহী, সোশ্যাল ডারউইনিস্ট [শক্তিবানের জয় প্রাকৃতিক আইন], দার্শনিক-বিজ্ঞানী হাক্সলির ইয়োরোপীয় বংশগতিবাদী [Eugenics] মানবাদর্শ ট্রান্সহিউম্যানিস্টদের কৌশলে এড়িয়ে যেতেই দেখা যায়। যদিও নতুন শিল্পবিপ্লব কালের মানবধারণায়, পৃথিবীতে জাতিতাত্ত্বিক অক্ষ ইতিমধ্যে স্পষ্ট। যে-আলোচনায় আরেকটু পর সঙ্গত কারণেই ফিরে আসতে হবে।

চিত্র ৪: পোস্ট-হিউম্যান: মেশিন-কনশাজনেস রূপচিত্র-৩

নিছক ধারণা থেকে বিকশিত হয়ে, পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক-ভাবনাসহ ট্রান্সহিউম্যানিজমকে একটি ইশতিহার বা ঘোষণাপত্র নিয়ে হাজির হতে দেখা যায় ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা'র [১৯৫২] *দ্য এন্ড অব হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান* [১৯৯২] বইটি প্রকাশের ছ-বছর পর। ১৯৯৮ সালে, প্রতিষ্ঠিত হয় 'বিশ্ব ট্রান্সহিউম্যানিস্ট সংঘ' [World Transhumanist Association]। অংশগ্রহণ করেন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইজরাইল ও ইয়োরোপের খ্যাতনামা অ্যাকাডেমিগুলোর এবং অ্যাকাডেমিগুলোর বাইরের অর্ধশতাধিক পশ্চিমা দার্শনিক-বিজ্ঞানী প্রতিনিধি। সম্মেলনে 'বিশ্ব ট্রান্সহিউম্যানিস্ট সংঘ'র ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয়। ঘোষণাপত্রটি পরে ট্রান্সহিউম্যানিস্টদের নানা ঘরানা ও সংঘ-গোষ্ঠী নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, উদ্যোগ-উদ্যম আর বিনিয়োগের ছায়ায় নানাভাবে সংস্কার ও রূপান্তর করে ব্যবহার করে চলেছে। ২০০৯ সালে বৃটিশ ট্রান্সহিউম্যানিস্ট, অক্সফোর্ড-এর গবেষক ডেভিড পিয়ার্স [১৯৫৯] প্রতিষ্ঠিত [অক্সফোর্ড কোলাবোরেটেড] প্রতিষ্ঠান 'হিউম্যানিটি+' বিশ্ব ট্রান্সহিউম্যানিস্ট সংঘের ঘোষণাপত্রটির মৌলিকতা অক্ষুণ্ন রেখে, মার্জিত

আকারে, নিজেদের বোর্ডসভায় অনুমোদন করে – যা ইয়োরোকেন্দ্রিক ট্রান্সহিউম্যানিস্ট চিন্তাধারায় গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। ঘোষণাপত্রের মোট এগারোটি দফাকে 'ঝুঁকিও বিপদ, সমর্থন ও অনুমোদন, আশা ও সম্ভাবনা, দায় ও কর্তব্য' এমন চারটি মোটাদাগে সাজালে এমন দাঁড়ায়: [সমন্বিত ও সংক্ষেপিত: প্রাবন্ধিকের অনুবাদে]

১. আমরা মনে করি, মানবতা বিশাল এক ঝুঁকির মুখে। বিশেষ করে নতুন প্রযুক্তি অপব্যবহারের দিক থেকে তাকে বিশাল মূল্য দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। এমন সম্ভাব্য বাস্তবতা আসছে, যার কাছে, আমাদের যা-কিছু মূল্যবান তার বেশির ভাগটা, এমনকি সবটা খোয়াতে হতে পারে। এর কিছু খুবই কঠোর, কিছু আবার খুবই সূক্ষ্ম। [...] আমরা বিশ্বাস করি, সব অগ্রগতিই পরিবর্তন কিন্তু সব পরিবর্তন অগ্রগতি নয়।

২. আমরা মানব প্রজাতি এবং মানবেতর সকল প্রাণী এবং ভবিষ্যতের যে-কোনো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সংশোধিত জীবন-প্রকরণ, অথবা অন্য যে-কোনো বুদ্ধিমত্তা, যা প্রাযুক্তিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি জন্ম দিতে পারে – অমন সকল সংবেদিতার [Sentience] জন্ম ও অস্তিত্ব সমর্থন করি। স্মৃতি, মনোযোগ ইত্যাদি মনোদৈহিক শক্তি সহায়কবিজ্ঞান-প্রকৌশল ব্যবহারে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন পছন্দকেও আমরা অনুমোদন করি। বার্ধক্য, অনৈচ্ছিক যন্ত্রণা, জ্ঞানগত নানা ত্রুটি এবং এ-পৃথিবীতে বন্দি থাকার মতো সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে আমরা বৃহত্তর মানবিক সম্ভাবনা কল্পনা করি।

৩. আমাদের বিশ্বাস, মানবীয় সক্ষমতার অনেকটাই এখনো আমাদের উপলব্ধির বাইরে। এমন সম্ভাব্য পরিস্থিতি আছে, যা বিস্ময়কর রকমের উন্নত জীবনব্যবস্থায় নিয়ে যেতে পারে আমাদের। মানুষের দূরদৃষ্টি ও জ্ঞানগত অগ্রগতি জরুরি অগ্রাধিকার হিসেবে আমাদের বিবেচনায় নেয়া উচিত।

৪. আমাদের প্রয়োজন, ঝুঁকি ও সুযোগ উভয়কে গুরুত্বের সাথে নেয়া।প্রয়োজন, অস্তিত্বগত ঝুঁকি লাঘব করা; জীবন ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা। স্বায়ত্তশাসন ও ব্যক্তি-অধিকারকে সম্মান করা। বিশ্বের সকল মানুষের স্বার্থ ও মর্যাদার প্রতি সচেতন থাকা ও সংহতি প্রকাশ করা।ভবিষ্যতে টিকে থাকা প্রজন্মের প্রতি নৈতিক দায়গুলো বিবেচনায় রাখা। নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হওয়া।[১৭]

এগুলো ছাড়াও দার্শনিক ও জ্ঞানগত মুক্তি [Cognitive Freedom], ভাষা ও যোগাযোগ-স্বাধীনতা, অবারিত প্রবেশ [Wide Access] ইত্যাদিও ট্রান্সহিউম্যানিস্ট নীতি-লক্ষ্যের সাথে যুক্ত। 'বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা'র পাশাপাশি 'আন্তর্জাতিক সহযোগিতা'ও ট্রান্সহিউম্যানিস্ট ঘোষণাপত্রে জায়গা পেয়েছে। তবে, উপরে বিন্যস্ত দফাগুলো খোলাখুলিভাবে বর্তমান মানবতাকে এ-বার্তাটাই মূলত দেয়: ভবিষ্যতে এমন বাস্তবতা আসছে, যার কাছে, আমাদের যা-কিছু মূল্যবান, তার বেশির ভাগটা এমনকি সবটা হারাতে হতে পারে। যার কিছু খুবই কঠোর, কিছু আবার সূক্ষ্ম। এমন বার্তা এখানে পাওয়া যায়, যাতে 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও ব্যক্তি-অধিকার ক্ষুণ্ন হবার' মতো বাস্তবতা আছে; 'বিশ্বব্যাপী মানুষের স্বার্থ ও মর্যাদা বিনষ্ট' হবার আশঙ্কা আছে। তবু, শেষত, আগে উল্লেখ করা এনবিআইসি [ন্যানোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, ইনফরমেশন সাইন্স এবং কগনিটিভ-সাইন্স] মেথড-এর ছায়াতলে ট্রান্সহিউম্যান ঘোষণাপত্রের কারিগরগণ মানব পরিচয়ের মহাবদলকেই [Grand Shift] স্বাগত জানান [ঘোষণাপত্র: ২ ও ৩] –'মানুষের কাছে মূল্যবান এমন

অনেক কিছু', এমন কি 'সবটা হারানোর ঝুঁকি' [ঘো.প: ১] নিয়েও। লক্ষ করবার ব্যাপার যে, ঘোষণাপত্রে ঝুঁকিটাকে সুযোগ-এর গুরুত্বে দেখা হয়েছে – খোলাখুলিভাবে [ঘো.প: ৪]।

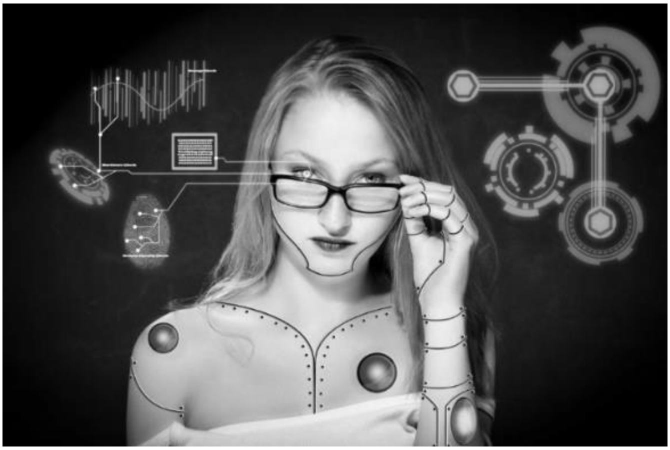

চিত্র ৫: যাত্রাকালের ট্রান্সহিউম্যান: যন্ত্রটা এখনও বাহ্যিক, তবে অসামান্য ক্ষমতার

বিশ্ব ট্রান্সহিউম্যানিস্ট সংঘের কলা-কুশলীদের চিন্তায়-গবেষণায়, এরই মধ্যে নানা দার্শনিক-তাত্ত্বিক মতবৃত্তও গড়ে উঠেছে – যা আগেও একবার বলা হয়েছে। এবার সেদিকে [একটু] নজর দেয়া যাক, ছোটো করে। মানুষের ব্যক্তিজীবন উন্নয়ন, জরা ও বার্ধক্য দূর করা, দেহ-মনের ক্ষমতা বাড়ানো – এমনসব লক্ষ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে 'ইনডিভিজুয়াল ট্রান্সহিউম্যানিজম'। একে 'সেল্‌ফ মোডিফিকেশন' বা 'বডিমোডিফিকেশন' হিসেবেও দেখেন কেউ কেউ।[১৮] এর সহোদর চিন্তা হিসেবে পরিচিত ট্রান্সহিউম্যানিস্ট 'দীর্ঘায়ুবাদ' [Longevism]; যাকে 'সার্ভাইভালিস্ট ট্রান্সহিউম্যানিজম' হিসেবেও দেখা হয়। ট্রান্সহিউম্যানিস্টদের একটি 'আনন্দবাদী' [Hedonistic Imperative] ধারাও আছে; যারা মনে করে, 'জিনপ্রকৌশল ও অতিক্ষুদ্র-প্রকৌশল যদি সত্যিকার অর্থে উৎকর্ষে যেতে পারে, তার মাধ্যমে মানুষের সব রকম শারীরিক যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ দূর করাই হওয়া উচিত ট্রান্সহিউম্যানিস্ট চিন্তার আসল লক্ষ্য।'[১৯] এ-ধারার 'এক্সট্রোপিয়ান' গোষ্ঠী 'হিম-প্রকৌশল' [Crionics] ব্যবহার করে বিপর্যয়-উত্তর [Post Apocalypse] পৃথিবীতে মানুষ ও মানবচিন্তাকে আবার জন্ম দেবার প্রস্তুতি নিয়ে চলেছেন।[২০] এরই মধ্যে এর প্রয়োগিক ধারা এমন 'জৈব-সংরক্ষণাগার' [Biobank] গড়ে তুলেছে, যেখানে বিপুল টাকার বিনিময়ে, মৃত্যু-পরবর্তী মগজ জমা রাখা যায়। ট্রান্স হিউম্যানিস্ট ম্যাক্স মোর তার 'এক্সট্রোপিয়ান' ধারণায় নিটশের [১৮৪৪-১০০] 'ওভারম্যান' তত্ত্বের অনুপ্রেরণার কথা ধন্ধহীনভাবে প্রকাশ করেন। তার মতে: নিটশে মানব-অগ্রগতির এমন এক প্রান্ত উন্মোচন করে দেখিয়েছেন, যা বুনিয়াদি মানবধারণাকে পার হয়ে যায়। নিটশের মানবধারণা বর্তমান মানবসত্তার সীমাবদ্ধতাগুলো থেকে মুক্ত, নির্ভুল ও পরিপূর্ণ মানবসত্তা – তবে তা কোনো অতিপ্রাকৃতিক, আধ্যাত্মিক, অধিসত্তা [Metaphysical] নয়।[২১]

এদিকে সামষ্টিক-মানবতার কল্যাণ নিয়ে ভাবছে 'টেরেস্ট্রিয়াল ট্রান্সহিউম্যানিজম'। আর,ব্যাপ্ত-মহাবিশ্বে মানুষেরঅস্তিত্ব ও উপস্থিতিকে প্রসারিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে 'কস্‌মিক ট্রান্সহিউম্যানিজম'। ট্রান্সহিউম্যানিজম-এর 'ভবিষ্য-পাঠ' [Future Studies] বিভাগ ইতিমধ্যে

আগামী মানুষের সম্ভাব্য আকার-আকৃতি, ধর্মাধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা, লিঙ্গ-লিঙ্গান্তর, জীবনবোধ,আত্মবোধ, আত্মপরিচয় ইত্যাদি নানা দিক নিয়ে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, মূল্যায়ন ও নির্বাচনের নিয়মতান্ত্রিক পাঠ্যসূচি ও পাঠপদ্ধতি গড়ে তুলেছে। এদের সবচেয়ে অগ্রসর বৃত্ত 'ট্রান্সহিউম্যানিস্ট টেকনোলজিক্যাল সিংগুলারিটি' মনে করে, ২০৫০ থেকে ২০৬০-এর মধ্যে অতিমানব কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তার আগমন নিশ্চিত;[২২] যার কাজ, আগামী মানুষের ঠিকানা নির্ধারণ করা ও তার বাস্তবায়নে সুপরিকল্পিত পথ-পদ্ধতির পরামর্শ দেয়া। 'সিংগুলারিস্ট'দের মতে, 'এর পর-পরই বর্তমান মানব-ধারণার ইতি ঘটবে। যেখান থেকে যাত্রা শুরু হবে পোস্ট-হিউম্যান মানবপর্বের।'[২৩]

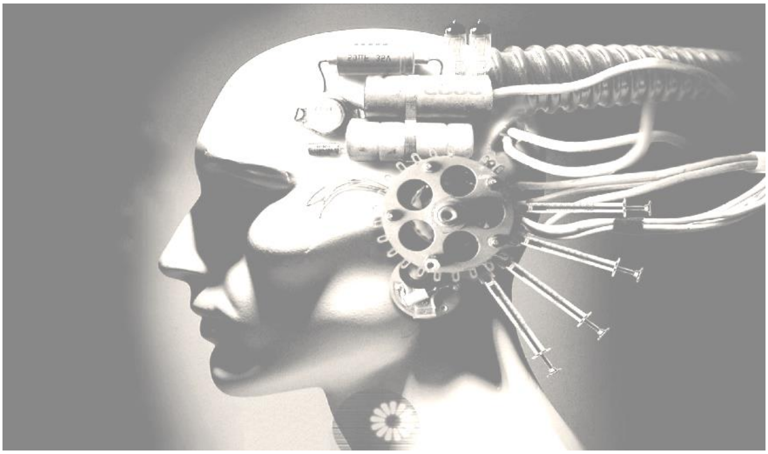

চিত্র ৬: ট্রান্স-হিউম্যান: ন্যানোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, ইনফরমেশন সাইন্স এবং কগনিটিভ-সাইন্স-এর সমন্বয়ে

সাইন্স ফিকশন জাতের [Genre] উপন্যাস ও চলচ্চিত্রেও ট্রান্সহিউম্যানিস্ট গল্প-কথনের [Story Telling] ইতিহাস শত বছরের পুরোনো। এসব রচনায়-নির্মাণে, যান্ত্রিক উৎকর্ষের ফলে মানুষের বদলে যাওয়া জীবনরূপ আঁকা হয়। গল্পগুলোতে প্রায়ই দেখানো হয়, ধ্বংস-পরবর্তী [Post Apocalyptic] হতাশাজনক চিত্রবাস্তবতা; যা বর্তমান মানুষের মানবীয় আবেগের অভিজ্ঞতাটিকে অনেক সময়ই পরীক্ষা ও বেদনায় ফেলে দেয়। যদিও এসব আখ্যানে সামগ্রিকভাবে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সমান্তরালে মানবতার উজ্জীবনকেই সম্ভাব্য বাস্তবতা হিসেবে আশা করা হয়। ফিকশনগুলোতে আগামী মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, শিল্পবোধ, শিল্পকলা, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, রুচি, মনন আর নীতি-নৈতিকতা [...]-সহ মানবিক [আরো] নানা অভিজ্ঞতা কল্পনারও চেষ্টা আছে।[২৪] এ-আখ্যানধারার গল্প-বলিয়েরা, যাদের অনেকেই পেশাজীবী বিজ্ঞানী এবং যাদের অনেকের বিশ্বাস: রেনেসাঁ-শাসিত বর্তমান মানবধারণার 'মহাবদল' ঘটতে চলেছে। বাতিল হতে চলেছে আগত মানব-ধারণার কাছে বর্তমান মানবধারণা। এ-ধারার ফিউচারিস্টগণ মনে করেন, 'এ-শতকেরই শেষ দিকে, মানুষ তার অর্গানিক তথা জৈবিক মানবত্বের শেষ ধাপে চলে যাবে। মানুষ নিজের দায়িত্ব [কর্তৃত্ব] তুলে দেবে, নিজ হাতে, যন্ত্রের হাতে।'[২৫]

এরই মধ্যে, নিউটন-আইনস্টাইনদের বলগতি বিজ্ঞান 'কোয়ান্টাম কণাবিদ্যা'য় উত্তরিত হয়েছে। উল্লম্ব তথা স্বতন্ত্র স্তম্ভের মতো আলাদা আলাদাভাবে বিকশিত হাজার-হাজার বছরের গাণিতিক-

প্রাকৃতিক জ্ঞানগুলো বিগত তিন দশক ধরে এক পাটাতনে, একসাথে এসে মিশেছে – পরস্পর মিত্র আর সহযোগী হয়ে আনুভূমিকতায়। অনেক নতুন সম্ভাবনার গল্প বুনছে তারা, এক স্বরে, নতুন পৃথিবীর জন্যে। রেনেসাঁর আখ্যান থেকে পাওয়া 'মহান' মানবধারণা আর মানবার্থকে ডারউইনবাদের পক্ষে থেকেই ইতিমধ্যে নাকচ করেছেন বিজ্ঞান দার্শনিক তাত্ত্বিক-পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং [১৯৪২-২০১৮]। 'ঈশ্বর নেই, তা-ই শুধু নয়, এমনকি মানুষের জীবনেরও কোনো অর্থ নেই। কারণ, মানুষের ফ্রি-উইল বা স্বাধীন ইচ্ছা নেই – মানুষের কৃতকর্মের পুরোটাই স্থান-কাল-ঘটনা দ্বারা নির্ধারিত। আর তাই, মানুষের পরকাল নাই, নাই পরকাল ভোগ।'[২৬] পরকালহীন, জীবনার্থহীন মানুষের আর ভয় কী ইহকালটাকে দীর্ঘ করে, এ-জীবনে পরকাল [Immortality] গড়ে নেবার চেষ্টা করতে [হকিং তা চাননি যদিও] – জীবনের মানেটা নিজ হাতে গড়ে নিতে?

ট্রান্সহিউম্যানিস্ট ম্যাক্স মোর [১৯৬৪] 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের বুদ্ধিমান বিবর্তনকে তাই স্বাগত জানান।'[২৭] নিক বস্ট্রম-এর মতে, 'মানুষের কাছে, এ-পৃথিবীর ইতিহাস মানবসভ্যতার ইতিহাস। প্রকৃতির নীতিগুলোর ভিতর দিয়ে, সুদীর্ঘ বিবর্তন পার হয়ে, এ-পৃথিবীতে মানুষের অনন্য বিকাশ। আত্মচেতন ও বিশ্বচেতন মানুষ তার অতুলনীয় জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় পৃথিবীতে একটি মানবার্থেরও [Meaning of Life] জন্ম দিয়েছে। প্রমাণযোগ্যভাবে এক লাখ বছরেরও বেশি বয়সী মানবার্জন মানব-ইতিহাস থেকে মুছে যাওয়া মানবতারই চূড়ান্ত ক্ষতি।'[২৮] *রিডিজাইনিং হিউম্যান্স: চুজিং আওয়ার জিন্স, চেঞ্জিং আওয়ার ফিউচার* [২০০৩] গ্রন্থের লেখক গ্রেগরি স্টক [১৯৪৯] এমন মত প্রকাশ করেন, 'জেনেটিক বিজ্ঞান আজ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যেখানে, কোনো সরকার, কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী কিংবা কোনো সামাজিক সাংস্কৃতিক রীতি-সংস্কার আর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না, আগামীর পিতামাতাকে, তাদের চাওয়া অনুযায়ী সন্তানের পিতা-মাতা, আকার-স্বভাব, রূপ-গুণ বেছে নিতে দিতে।'[২৯] বস্ট্রম আরও এগিয়ে জানান, 'পোস্ট-হিউম্যান পর্যায়ে উন্নীত হবার আগেই যদি মানুষের বিলুপ্ত হয়ে পড়ার পরিস্থিতি এসে যায়, তাতেও সমস্যা নেই, কোয়ান্টাম-সিম্যুলেশন তত্ত্বের প্রয়োগিক অগ্রগতি মানবচিন্তাকে আগামী পৃথিবীতে ধরে রাখতে সক্ষম হবে। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মানুষের চিন্তারাশি টিকে থাকবে কম্পিউটার-সিম্যুলেশনে – আর সিম্যুলেটেড মানুষেরা ঘুরে বেড়াবে পৃথিবী ও আকাশ জুড়ে। পৃথিবীর প্রাণ-পরিবেশ সহনীয় হয়ে এলে, সিম্যুলেটেড অতিমানবেরা মানবিক মানুষকে আবার জন্ম দিবে — পৃথিবীতে।'[৩০]

ইতিমধ্যে ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠিত নানা অক্ষের মহাকাশ কম্পানিগুলোর তৎপরতা; আন্তর্জাতিক দূরদেখন-প্রকৌশলের [Telescope Technology] অকল্পনীয় অগ্রগতি ও বিশ্বব্যাপ্ত ঐক্য; চাঁদে, মঙ্গলে আর মহাকাশে বিপুল বিনিয়োগের [যার জোগান দিতে হিমশিম বাকিবিশ্বের মানুষ] ঘোষণা ও উদ্যম-উদ্যোগ; বৈশ্বিকভাবে হিমপ্রকৌশল বা ক্রায়োনিক্স বিদ্যার ব্যাপক প্রয়োজন ও প্রসার; অতি-ধনীদের মহাকাশ ভ্রমণের অতি-সাম্প্রতিক প্রতিযোগিতা; লিবারালাজিম-এর ছায়ায় ব্যক্তিবিনোয়োগ তথা প্রাইভেটকে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান; এবং বিশ্বজুড়ে মিলিটারি পাওয়ারকে লিবারাল উন্নয়নের সঙ্গী করে তোলা– উপরে বলা আখ্যানের উপরিতল আলামত হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। হকিং-এর এককালের সহকর্মী, মার্কিন তাত্ত্বিক-পদার্থবিজ্ঞানী, সম্প্রতি প্রকাশিত ও আলোচিত *দ্য গড ইক্যুয়েশন: দ্য কোয়েস্ট ফর আ থিয়োরি অব অ্যাভরিথিং* [২০২১] গ্রন্থের লেখক মিচিও কাকু দাবি করেন, 'আগামী ১০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর মানুষ সূর্যালোককে শক্তির উৎস বানিয়ে [Dyson Sphere] সৌরজগত-বিস্তৃত মানববসতি গড়তে চলেছে। যাকে তিনি দ্বিতীয়

প্রজন্মের মানবসভ্যতা হিসেবে কল্পনা করেন। পরের পঞ্চাশ বছরে 'গ্যালাক্টিক' পরিসরে তৃতীয় প্রজন্মের মানবসভ্যতার ধারণাও দেন তিনি।'[৩১] তাঁর মতে, যদি 'ওয়ার্ম-হোল' তত্ত্বের প্রমাণ ও প্রয়োগ-প্রকৌশল কাজে লাগানো মানুষের পক্ষে সত্যিই সম্ভব হয়, এমনকি চতুর্থ প্রজন্মের আন্তশ্ছায়াপথ [Inter Galactic] মানব-সভ্যতার কথা ভাবাও মানুষের পক্ষে সম্ভব। তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞান আজ অতদূরও ভাবাতে পারছে মানুষকে।[৩২]

চিত্র ৭: পোস্ট-হিউম্যান মেশিন কনসাজ্‌নেস। রেনে দেকার্ত-এর মাইন্ড-বডি ডুয়ালিটি থেকে বডিটার মুক্তি ঘটেছে। কেবল মাইন্ড বা কনসাজনেসটাই টিকে আছে

সে-পর্যায়ে যাবার আগের ধাপে, কিছু সংখ্যক 'রিয়াল' মানুষের সাথে বিপুল পরিমাণ 'মেশিন-সিম্যুলেটেড' ট্রান্সহিউম্যানের পৃথিবীতে যৌথবাসের এজেন্ডা [রূপকল্প] নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ের জায়গাগুলোও সামনে আসছে। বিশেষ করে, কম্পিউটার সিম্যুলেটেড মানুষদের নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়ের প্রশ্নে। অতি-বুদ্ধিমান সিম্যুলেটেড-মানুষের [Super Inteligent Sentience] ইচ্ছা, আগ্রহ, বোধ, চেতনা, জীবন, জীবনার্থ ইত্যাদি যদি সর্বজনীন মানববান্ধব করা না যায়; তাহলে, যে-কারণে, মানুষ নিজেদের বিলোপ করে বানানো মানুষের বিবর্তনকে স্বাগত জানাবে, নিজেদের তুলে দেবে মেশিনের হাতে, তা ব্যর্থ হবার আশঙ্কাই থাকবে বেশি। অগণিত শঙ্কাবাদীর মতো 'ইনস্টিটিউট অব ইথিক্স অ্যান্ড ইমার্জিং টেকনোলজি'র প্রতিষ্ঠাতা সুইডিশ অক্সফোর্ডিয়ান দার্শনিক-বিজ্ঞানী বস্ট্রম নিজেও মনে করেন,'অতি-বুদ্ধিমান অতি-মানবেরা নিঃসন্দেহে সম্ভাব্য তথা আসন্ন মানবসঙ্কট মোকাবেলা ও সমাধান করার মতো সক্ষম সত্তা হবে – কিন্তু এ-নিশ্চয়তা আদৌ নেই যে, সেসব অধিসত্তা [Supra Persona] মানববান্ধব হবে।'[৩৩] অগণিত মানবতাবাদীর মতো স্টিফেন হকিং-এরও একটি জোরালো সাবধানবাণী জ্ঞানজগতে বিদিত। এসব বিবেচনায়, ট্রান্সহিউম্যানিস্ট রে-কুর্জওয়েল [১৯৪৮][৩৪] প্রস্তাব করেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্ধ-উন্নয়নই শেষ কথা নয়, তার উন্নয়ন ঘটাতে হবে কিছু গোল্ডেন রুল-এর আওতায়; যাতে করে তারা, শেষ পর্যন্ত, মানববিধ্বংসী হয়ে ওঠার সুযোগ না পায়।'[৩৫] এসবের মধ্যেই, *দ্য ইমোশন মেশিন* [২০০২] গ্রন্থে ট্রান্সহিউম্যানিস্ট মারভিন মিনস্কি [১৯২৭-২০১৬] ঘোষণাই করে দিয়ে গেছেন, 'বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা উদার গণতন্ত্র ও মুক্তবাজারই বর্তমান মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের শেষ কথা। বিশ্ব এখন নতুন মানবসরকার গঠনের দিকে।'[৩৬]

ট্রান্স-[পোস্ট]-হিউম্যানিজম ও তার তত্ত্বদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া গেল। তবে, প্রযুক্তির নিজেরও একটি দর্শন আছে, যেমন আছে বিজ্ঞানেরও নিজের দর্শন। প্রযুক্তির নিজের দর্শন বিষয়ে ট্রান্সহিউম্যানিস্টদের ধারণা অস্বচ্ছ বলে মনে হয় না। তারা মনে করে, প্রযুক্তি বিকাশের ইতিহাস আর মানবসভ্যতা বিকাশের ইতিহাস যদি সমান্তরাল হয়; তবে, এটি হওয়া সম্ভব যে, উন্নত প্রযুক্তি বিকাশের প্রাথমিক স্তরেই আছে মানুষ। সেক্ষেত্রে প্রযুক্তির গতিকে বাধা দেয়া সভ্যতাসম্মত হবে না। মানুষ যদি তার আত্মঠিকানা আবিষ্কারের আরো উন্নত স্তরে যেতে চায়, তাহলে প্রায়ুক্তিক জ্ঞানই তার একমাত্র উপায় হবার কথা। ট্রান্সহিউম্যানিস্টরা তাই প্রযুক্তি ব্যবহার করে, মানুষের দক্ষতা, যোগ্যতা ও সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিকাশেরই পক্ষে থাকেন – দার্শনিক দিক থেকে। মনে করেন, গাণিতিক-বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই নির্ভুল-নিরপেক্ষ জ্ঞান। এ-জ্ঞান নিরপেক্ষভাবে কল্যাণ ও মঙ্গলকামী। মানুষ প্রযুক্তির অগ্রগতিকে ভয় পায়, সেটা তার অপব্যবহারের কারণে। এ-অপব্যবহারের আশঙ্কার কথা ট্রান্সহিউম্যানিস্ট ঘোষণাপত্রের দ্বিতীয় বাক্যেই আছে – 'মানবতা বিশাল এক ঝুঁকির মধ্যে। বিশেষ করে নতুন প্রযুক্তি অপব্যবহারের দিক থেকে তাকে বিশাল মূল্য দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে' ঘোষণায়।

দেখা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণকামী দর্শন মেনে নিয়েও ট্রান্সহিউম্যানিস্টরা 'নতুন প্রযুক্তির অপব্যবহারগত দোষকে' বরণ করার জন্যে মানবতাকে প্রস্তুত হতে বলেন [!]। এর মানে, মানবরক্ষার আগামী সভ্যতায়ও প্রযুক্তির অপব্যবহার চলবে – কারণ, এটা এরই মধ্যে দ্রুততম পুঁজিগঠনের সবচেয়ে সহজ উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। এমন মনে হয়, এ-প্রতিষ্ঠা বিরাজ করবে নতুন সভ্যতা জুড়েই। তাই 'প্রযুক্তির কল্যাণকামী দর্শন' ট্রান্সহিউম্যানিস্ট ঘোষণাপত্রে অঙ্গীকার করা হলেও, তেমন কোনো কাজের দাবি হিসেবে উত্থাপিত বলা যাবে না। 'স্বায়ত্তশাসন ও ব্যক্তি-অধিকারকে সম্মান করা, বিশ্বের সকল মানুষের স্বার্থ ও মর্যাদার প্রতি সচেতন থাকা ও সংহতি প্রকাশ করা, সকল অংশীজনের মতামতকে আমলে নেয়া'র মতো জরুরি বিষয়গুলো ট্রান্সহিউম্যানিস্ট ঘোষণাপত্রে জায়গা পেয়েছে যদিও, এগুলো বরং প্রযুক্তির মালিকানাহীন মানুষদের আরও ভয়ের মধ্যে ঠেলে দেয় – ঝুঁকিগুলো কোথায় তা স্পষ্ট করে দিয়ে। নজর এড়ানো ঠিক না যে, এটা বিশ্বের স্বাধীন-সার্বভৌমজাতি-রাষ্ট্রগুলোর 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন'কেও চ্যালেঞ্জ মনে করে। ইতিমধ্যে অগ্নিদেয়ালহীন [Firewall] জাতীয়তাবাদী জাতি রাষ্ট্রগুলোর শিক্ষা-দীক্ষা, অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা, মিডিয়া-সংস্কৃতি, সেবা-স্বাস্থ্য, বাজার-বিপণন ইত্যাদি, এমনকি প্রশাসন ও কূটনীতি-সহ সবকিছুই অবাধ প্রবেশ, অবাধ নজরদারি, অবাধ নিয়ন্ত্রণ-এর আওতায় চলে গেছে। একে বৈশ্বিক পটভূমিতে খতিয়ে দেখলে, অনেক জাতি রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বের মতো বিষয় ও জাতীয় এজেন্ডা গুলোকে আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জালিক বাজারনির্ভর পুলিশি-ব্যবস্থা বলেই মনে হয় মাত্র। সমকালীন সমরকলা বা যুদ্ধকলা ঐতিহ্যবাহী চাণক্য-ম্যাকিয়াভিলিকে সঙ্গে নিয়েই আরো নিখুঁত হয়েছে। প্রথম যুগের যুদ্ধ ছিল স্থলভূমিতে, সামনা-সামনি, বল্লমে-বর্শায়, তীরে-তরবারে। দ্বিতীয় যুগের যুদ্ধে জলভূমিও ঢুকে পড়ে। যুদ্ধটা ছিল যতটা সম্ভব দূরত্বে বা আড়াল থেকে – কামানে-বন্দুকে। তৃতীয় যুগের যুদ্ধে আকাশও যোগ হয় – যুদ্ধ চলে যায় আরও দূরে – আকাশে – আণবিক শক্তিতে। চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবকালের বিশ্ব-ব্যবস্থায়, চতুর্থ যুগের যুদ্ধকলা হতে চলেছে অদৃশ্য ক্লাউড থেকে, সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি-গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে, অটোমেটিক গ্লোবাল পজিশনিং পদ্ধতি [জিপিএস] ব্যবহার করে। আগামীর যুদ্ধকলার আসন্ন ভয়াবহতা বুঝতে সর্বোচ্চ আধা-দশক

সময় লাগতে পারে আমাদের। তবে, অনেকেই মানছেন, সে-আঁচ বিশ্ববাসীর গায়ে লাগতে শুরু করে দিয়েছে।

ট্রান্স-[পোস্ট]-হিউম্যানিজম বা আগামীর মানবদর্শনের পরিভাষা, সংজ্ঞা, ধারণাগত ইতিহাস, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, মতাদর্শিক চিন্তাবৃত্ত, সম্ভাব্য প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির ছোটো-পরিসরপরিচয় নেওয়া গেল। এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক। তবে, সেটা প্রযুক্তির দোষ নয়, তার অপব্যবহার ও অপব্যবহারকারীর দোষ – কথাটা আমাদের মাথায় থাকুক।

চিত্র ৮: ক্রিয়েশন অব অ্যাডাম, মাইকেলেঞ্জেলো, ১৫০৮-১৫১২, মানুষের হাতে ঈশ্বরের ক্ষমতা হস্তান্তর, সিস্টাইন চ্যাপেল, ভ্যাটিকান, রোম

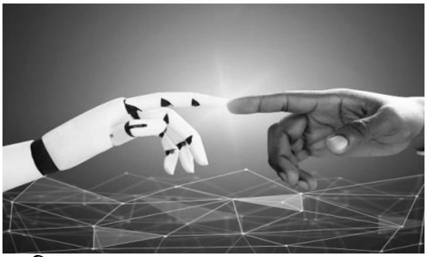

চিত্র ৯: যন্ত্রের হাতে মানুষের ক্ষমতা হস্তান্তর, ট্রান্সহিউম্যানিস্ট গ্র্যানড-শিফ্‌ট

২০১৪ সালে অক্সফোর্ডের কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা প্রকল্পটি কিনে নেয় মার্কিন ব্যক্তিমালিকানার প্রযুক্তি-প্রতিষ্ঠান গুগল তথা অ্যালফাবেট।[৩৭] ঘটনাটিকে ট্রান্সহিউম্যানিস্ট মানবপর্বের দিকে বড়ো অগ্রগতি হিসেবে দেখা হয়। ২০১৬ সালের পর গুগল-এর 'আলফা-গো' নামের কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তার কাছে চিন-হংকং-এর ঐতিহ্যবাহী 'গো'-খেলার [বিস্ময়কর পরিমাণ বিকল্প চালের খেলা] চ্যাম্পিয়নরা আর জিততে পারেনি।[৩৮] সে-হিসেবে, ২০১৬-কে বলা হয়, নতুন লক্ষ্যে মেশিন-লার্নিং তথা কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা জগতে প্রবেশের বছর।[৩৯] অল্পদিনের মধ্যেই চিনের উদ্ভাবনা ও নেতৃত্বে, একদা অক্সফোর্ডের গবেষণা প্রকল্পটি, গুগল মালিকানার 'আলফা-জিরো' তথা 'ডিপ-মাইন্ড' হয়ে, কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা জগতে সর্বগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে হাজির হয়। অন্য কথায়, কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তার বিপুল অগ্রগতি, বিশাল এক মেশিনের মতো আজকের পৃথিবীর প্রযুক্তি-ব্যবহারকারী প্রতিটি মানুষকে বেঁধে ফেলেছে একটি স্থানে, একটি কালে। বিশ্বটাকে করে ফেলেছে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ও বিনিময় ক্ষমতার অধীন। জানা দরকার যে, বর্তমানে আমরা যে-কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করি, তা আর্টিফিসিয়াল ন্যারো ইন্টেলিজেন্স মাত্র। এ-শতকের প্রথম ভাগেই আর্টিফিসিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এবং শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর্টিফিসিয়াল সুপার-ইন্টেলিজেন্স ফিউচারিস্টদের লক্ষ্য। এরই মধ্যে 'কোয়ান্টাম-কম্পিউটিং'-এর বড়ো রকমের অগ্রগতি দানবীয় ক্ষমতার বার্তা আনছে। সে-বার্তার মর্মার্থ বুঝতে, পিছিয়ে পড়া রাষ্ট্রগুলোর, দৈনন্দিন সমস্যা আর চাওয়ায় কাতর নেটিজেন, ডিজিটাল, স্মার্ট মানুষেরা এখনো অনেকটাই অসজাগ।

এ-বিপুল শক্তির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-প্রকৌশল নিয়ন্ত্রণের নেতৃত্বে আছে একদিকে রাষ্ট্র হিসেবে কমিউনিস্ট-ক্যাপিটালিস্ট চিন; অন্যদিকে নিউলিবারাল পুঁজি ও ব্যক্তিমালিকানার কতগুলো মার্কিন প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান— যে-প্রতিষ্ঠানগুলো মার্কিন-ইজরাইল গোয়েন্দা ও সামরিক বিভাগের সাথে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করে।[৪০] যদিও, একাধিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনায়, এসব

প্রযুক্তি-প্রতিষ্ঠানের কোনো-কোনোটাকে মার্কিন রাষ্ট্রক্ষমতাকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে দেখা গেছে। এ-বিচারে, আগামী পৃথিবীর অক্ষ-ক্ষমতায় 'কমিউনিস্ট-ক্যাপিটালিস্ট' চিন আর 'লিবারাল-ক্যাপিটালিস্ট' মার্কিন ভূমিকা এক চেহারার নয়। যদিও তাদের আসল লক্ষ্যটি এক – নিয়ন্ত্রণ ও অবাধ নিয়ন্ত্রণ। ট্রান্সহিউম্যানিস্ট কল্যাণকামী প্রযুক্তির দর্শন তাই, এরই মধ্যে, এর মালিক ও উন্নয়নকারীদের 'অপব্যহারকেই' সামনে আনছে বেশি। ট্রান্সহিউম্যানিস্ট ঘোষণাপত্রেও অবশ্য মানবতার এ-পরিণতিকে অনিবার্য মানা হয়েছে: মানবতা গভীর সঙ্কটের মুখে – বিশেষত, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের দিক থেকে।

দেখা যাচ্ছে, দার্শনিকভাবে মানবকল্যাণের পতাকাবাহী কৃত্রিম-বুদ্ধিমতার মালিক ও উন্নয়নকারীদের কাছে প্রথমত বিশ্বছড়ানো বাজারই 'টার্গেট'। এ-বাজারের লক্ষ্য ক্রয়-বিক্রয় তথা কেনাবেচা। যেখানে প্রতিটি মানুষই, একই সাথে ক্রেতা আর বিক্রেতা। পণ্য, সেবা, জ্ঞান; এগুলোর উৎপাদন আর বেচা-কেনার ছকে বাঁধা ব্যক্তি ও সমাজ। এখানে ব্যক্তির পরিচয় দার্শনিক-বিজ্ঞানী রেনে দেকার্ত-এর প্রখ্যাত 'I Think therefore I am'-এর ব্যঙ্গবাচনে 'I shop therefore I am'– মানে, কেনার ক্ষমতাই ব্যক্তির অস্তিত্ব। এখানে বাজারনীতি হলো 'Customers Choice'– ভোক্তার পছন্দই আসল কথা। পর্ণোগ্রাফির ভোক্তা আছে, তাই এটা ইউটিউব থেকে সরানোর প্রস্তাব লিবারাল বাজারের নীতিসিদ্ধ নয়! এ-লিবারাল সাংস্কৃতিক অধিগহণের মূল লক্ষ্য একটাই— দ্রুততম পুঁজি। তবে, দেখার ব্যাপার যে, এ-নয়া বাজারে মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য [পারসোনাল ডাটা] সবচেয়ে মূল্যবান পণ্য। এ-তথ্যপণ্য প্রথমত বিক্রি হয় পণ্যের উৎপাদক বা প্রক্রিয়াকারী তথা ম্যানুফ্যাকচারারদের কাছে। ব্যক্তির বিশেষায়িত, শ্রেণিকৃত বা ক্লাসিফায়েড ব্যক্তিগত তথ্য থেকে নির্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে আর তার পছন্দ বা চাওয়াগুলোকে যেমন জানা যায়, তেমনি তার পছন্দ আর চাওয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ বা মোডিফাইও করা যায়। যা মোদ্দাকথায়, বিশ্বব্যাপী একচ্ছত্র ভোক্তা তৈরির পাশাপাশি 'রি-ডিজাইনিং-হিউম্যান্স' প্রকল্পের-ই বাস্তবায়ন।[৪১] জানা যাচ্ছে, এ-কাজগুলো হয়ে চলেছে অকল্পনীয় গাণিতিক শক্তির কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিয়ে। এরই মধ্যে বিশ্বছড়ানো 'ডাটাবাজার' গড়ে উঠেছে; যে-বাজারে তথ্য জ্বালানির চেয়ে বেশি দামি। অসংখ্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিগত তথ্য এসব। এ-হিসেবে, স্মার্ট পৃথিবীর স্মার্ট মানুষেরা উন্নত বুদ্ধিমত্তার ক্লাসিফায়েড 'কাঁচামাল' মাত্র। এ-কাঁচামাল তথা ব্যক্তির বিশেষায়িত তথ্যরাশি কী-ভাবে, কী-মূল্যে, কী-জন্যে নিরন্তর পার্টি থেকে পার্টিতে বিক্রি হয়ে চলেছে, তা দেখান মার্কিন সমাজ-মনোবিদ্যাবিদ সোশানা জুবফ [১৯৫১] তাঁর এ-কালের 'দাস ক্যাপিটাল'-খ্যাত *অ্যাট দ্য এজ অব সার্ভেইল্যান্স ক্যাপিটালিজম* [২০১৯] গ্রন্থে। তিনি দেখান, 'কী-করে, হাতে গোনা কয়েকটা প্রযুক্তি-প্রতিষ্ঠান আজকের মানুষের চিন্তাভাবনা, চাওয়া-পাওয়া, এমনকি জীবনের লক্ষ্যটা পর্যন্ত নির্ধারণ করে দিচ্ছে— পাল্টে দিচ্ছে মানবীয় জীবনাচার।'[৪২]

এ-আখ্যান সত্যি হলে, বিশ্বের 'কানেকটেড' জাতি-প্রজাতিগণ, বর্তমানে, দু-দুটি অন্তর্জালে আটকে যাওয়া গাণিতিক সত্তা [এনটিটি] বা অ্যালগরিদম মাত্র। এ-জালের কেন্দ্র বিরাজ করে যেখানে, তার নাম ক্লাউড বা আকাশ। জানা মতে রাশিয়া, ইরান, তুরস্ক, উত্তর কোরিয়া ও ভেনিজুয়েলার মতো গুটিকয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় তথ্য গোপন ও সুরক্ষিত রাখার মতো উপযুক্ত বৈদ্যুতিক-দেয়াল বা ফায়ার-ওয়াল আছে। যদিও সে-দেয়াল দুর্ভেদ্য এমন নিশ্চয়তা নেই। বাকি বিশ্বের মানুষেরা চিন-মার্কিন উভয় ক্লাউড-এর সমান বাসিন্দা – বাস করছে, এক ঘর দুই কক্ষের আকাশবাড়িতে। যে-স্থানকালে সে বাস করে বলে মনে করে, তা 'জিরো-ওয়ান' দ্বারা চিহ্নিত,

নিরূপিত, মীমাংসিত। ভাষাতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে ‘চিহ্নিত’ ও ‘নিরূপিত’ শব্দদুটির তাৎপর্য বিস্তৃত ও গভীর। খোলাখুলিভাবে, স্মার্ট পৃথিবীর স্মার্ট মানুষদের এটা জানতে হচ্ছে যে, মেশিন তার সম্পর্কে যেভাবে, যতটা সূক্ষ্ম ও নির্ভুল জানে; ততটা সে নিজেও জানে না। কানেকটেড প্রতিটি ব্যক্তির সমস্ত লিখন, কথন ও বিনিময় করা চিত্রমালা [স্ন্যাপ-শট, স্ক্রিন-শট, ফটো-ইমেজ, মুভি-ইমেজ, সাউন্ড ইমেজ, ইমোজি, মিম ...]; আর তাদের নিয়ে নিকটজন বা অজানা অন্যদের বিনিময় করা লিখন, কথন, চিত্রমালা নিয়ে শত-শত ঘণ্টার ‘বায়োপিক’ তথ্যচিত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়ার কারিগরি সক্ষমতা প্রযুক্তি-দানবদের হাতে এসে আছে [ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন প্রকৌশল]। পঞ্চাশ, একশ, দেড়শ বছর পর, আজকের স্মার্ট মানুষদের উত্তরাধিকাররা, তাদের প্র-প্র-পিতামহ-মহীদের শত শত ঘণ্টার ‘হার্ড রিয়ালিস্টিক বায়োপিক’ মুভিতে টাইম ট্রাভেল [অতীত ভ্রমণ] করতে পারবে – অনায়াসে।

নতুন বিশ্বের নতুন মানব-সংস্কৃতির দীক্ষার ভিতর মানুষ প্রবেশ করে গেছে। সাইবার সংস্কৃতিতে নজরে আসছে, Nothing to hide, Secret is crime; এবং প্রায় সতর্কবার্তার মতো, Silence will be the criticism।[৪৩] আর, লক্ষণীয়ভাবে, Troll is the culture – কারণ, ব্যক্তির সোশ্যাল-ক্রিটিক প্রয়োজন। ওয়াইড-এক্সেস তথা অবারিত প্রবেশ মেনে নিতে অভ্যস্তই হয়ে গেছে মানুষ কিংবা উপায়হীন। এদিকে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্রুত উন্নয়নের কাঁচামাল [ব্যক্তিগত তথ্য] বিক্রি করে দ্রুততম পুঁজিগঠন [Surveillance Capital]; বিশ্বব্যাপী অবাধ সামরিক নজরদারি [Military Surveillance]; বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে খ্রিস্টীয়-জায়নিস্ট হেজিমনি; তার সাথে, এক বিনিময়ব্যবস্থা [One Money], এক ভাষা [Mono Language], একেশ্বর [One God] – মার্কিন-ইহুদি ‘কোয়ান্টাম-বিশ্বের রূপকল্প’ [চিনকেন্দ্রিক কাউন্টার পোলার মাথায় রেখেই] মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছে। এ নীলনকশার বাস্তবায়ন অনেক মানবিক বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতায় বিশ্ববাসীকে নিয়ে যেতে চলেছে – এমন আশঙ্কা অবান্তর ও অমূলক ভাবার সুযোগ নেই। ইতিমধ্যে প্রাযুক্তিক-বিপর্যয় [Technological Disruption] নামের একটি ডিসকোর্স গুরুত্বের সাথে আলোচিত।[৪৪] যা ট্রান্সহিউম্যানিস্ট ঘোষণাপত্রের একেবারে শুরুতেই বলা হয়েছিল [স্পষ্ট করে] – আর যা এরই মধ্যে, বিশ্ববাসী বরণ করতে শুরু করে দিয়েছে।

আগামী পৃথিবীর ‘গরম কি ঠাণ্ডা যুদ্ধে’ চিন-মার্কিন দ্বিমেরু [Bipolar] ক্ষমতার ধরন আর লক্ষ্য বিচার করা রাষ্ট্রীয় কূটনীতির কাজ যদিও – এটা ধরে নেয়া বাস্তবতা যে: এ-যুদ্ধে বাংলাদেশ রাষ্ট্র কাঁচামাল বা জ্বালানি ছাড়া আর কোনো পক্ষই না – এখন পর্যন্ত। বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রসহ ফায়ার-ওয়াল বা অগ্নিদেয়ালহীন বাকি-বিশ্বের মানুষ ‘চিন-মার্কিন’ উভয় নজরদারিতে বাস করা একেকটি গাণিতিক ‘অ্যালগরিদম’ মাত্র। যারা কথিত ‘গ্রান্ড-শিফ্টের’ ঝুঁকি পুরোটা বরণ করতে চলেছে। ডেভ এগার্স [১৯৭০]-এর দুঃস্বাপ্নিক [Distopian] উপন্যাস ‘দ্য সার্কেল’ [২০১৩] অবলম্বনে, মার্কিন সিলিকন-ভ্যালির বিজ্ঞাপন, জেম্স পন্সোল্ড পরিচালিত সিনেমা ‘দ্য সার্কেল’ [২০১৭] দেখায়: মার্কিন সিলিকন-ক্লাউডকৃত কোনো [এমনকি অজানা] অপরাধের জন্যে, পৃথিবীর যে-কোনো ‘নেটিজেন’কে, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে, ঘোষণা দিয়ে, মাত্র ১২ সেকেন্ডে ধরে দেখানোর ক্ষমতা রাখে। এ-ক্ষমতার কাছে, যুক্তরাষ্ট্রের মতো আস্ত ফেডারেল রাষ্ট্রের আস্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনটা মাত্র পাঁচ-সাত মিনিটে, বিনা খরচে [স্বচ্ছতার সাথে] করে দেখানো কোনো ব্যাপারই না। চাইলে বছরে দশবারও করা যায় তা– কিংবা, যে-কোনো দিন, প্রতিদিন– সিলিকন লিবারাল-প্রাইভেটের ক্ষমতার প্রদর্শনী যেন।[৪৫] ইতিমধ্যে, চিন-মার্কিন কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা পৃথিবীর নেটিজেনদের সুরত-হাল

[Over Skin] নজরদারি [Surveillance] শেষ করে এনেছে বলে জানা যাচ্ছে। এটা প্রবেশ করেছে এখন ভিতরগত [Under Skin or Bio-organic] নজরদারিতে।

রাজ্যজয়, রাজ্যদখল, ধর্মযুদ্ধ [Crusade], সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশ; শক্তিবানের জয় প্রাকৃতিক আইন [Social Darwinism]; ইউরোপীয় বংশগতির শ্রেষ্ঠত্ব [Eugenics, White-supremacy]; আফ্রো-এশিয়ান কালোদের দাসত্ব, বঞ্চনা, মৃত্যু [Black Holocaust]; আমেরিকান শ্বেতসন্ত্রাস [Ku-Klux-Klan]; জার্মানিসহ পুরো ইয়োরোপের ইহুদিনিধন-ইহুদিবিদ্বেষ [Holocaust, Anti-semetism]; দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও আণবিক বোমার নির্মম ব্যবহার– এসব ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা মানুষকে জানায় – বৈদ্যুতিক প্রকৌশল নির্ভর চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকালের পৃথিবীটাও টেকনোলজির মালিকদেরই চূড়ান্ত দখলে থাকছে। আর, একালের টেকনোলজিও মানবরক্ষাকারী হচ্ছে না – অন্তত, এর প্রাথমিক 'কম্মোটা' হতে যাচ্ছে মানববিনাশী। ভেঙেপড়া জলবায়ুর সুযোগকে কাজে লাগিয়ে, ক্ষুধা-মন্দা, মারি-অতিমারি আর নতুন প্রযুক্তি-ব্যবহারের ঝুঁকিতে ফেলে একটি বড়ো জনগোষ্ঠীকে পৃথিবী থেকে বিদায় দেবার প্রস্তুতি চলছে বলে আঁচ করা যাচ্ছে। প্রযুক্তির নিজের দোষে নয়, প্রযুক্তির মালিকদের চাওয়া-মতো মানুষ ও সভ্যতা নতুন আকার পাচ্ছে। বলা হচ্ছে, টেকনোলজির মালিক, টেকনোলজির ভোক্তা আর টেকনোলজি-বঞ্চিত মানুষের ভিতর [আকাশ-মাটি] বৈষম্যই আগামীর [প্রাথমিক] ছবি। ব্যাপক ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, অটোমেশন, বিপুল বেকারত্ব এবং ধনী আপগ্রেডেড সুপারম্যান আর দরিদ্র ব্যাকডেটেড হিউম্যান-এর বিরাট বৈষম্য 'কোয়ান্টাম অ্যালগরিদম'-নির্ভর আগামী বিশ্বের অনিবার্য বাস্তবতা। ইজরাইল বংশোদ্ভূত ঐতিহাসিক, সমাজ-দার্শনিক ইয়োভাল নোয়া হারারি [১৯৭৬] আসন্ন বৈষম্যটাকে দেখছেন, 'মানুষ আর শিম্পাঞ্জির তুলনার মতো'।[৪৬]

এ সমাচার সত্য মানলে, পৃথিবীর সম্ভাব্য ভেঙেপড়া জলবায়ুর ভেঙেপড়া পরিবেশে; ভেঙেপড়া রাষ্ট্র ও সরকার-ব্যবস্থায়; বাজার ও মুদ্রানীতি, আইন ও দণ্ডাচার, সামাজিক নীতি-নৈতিকতাসহ মানবীয় আবেগ-অনুভূতি, শিল্প-সাহিত্য, ভাষা-শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্মাধর্ম, লিঙ্গ-লিঙ্গাচার ইত্যাদি সম্পূর্ণ নতুন বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে চলেছে। আগামী পৃথিবীর, আগামী সভ্যতার জন্যে নতুন আরেকটা 'গল্পবুননে' প্রযুক্তি-মালিকদের ইচ্ছা, খেয়াল, রুচি ও পছন্দই একচ্ছত্র থাকছে সেখানে। সে-কেন্দ্রিভূত বিশ্বব্যবস্থার দরোজায় দাঁড়িয়ে, ট্রান্সহিউম্যান-বিশ্বের আসন্ন বাস্তবতা বাংলাদেশ নামের একটা জাতি-রাষ্ট্রের জন্যে স্বপ্নের না-কি দুঃস্বপ্নের সে মীমাংসা কঠিন কিছু নয়। জর্জ অরঅয়েল [১৯০৩]-এর গুরুত্বপূর্ণ তবে নিরীহ রচনা *নাইন্টিন এইটি ফোর* [১৯৪৯] তৎকালীন সোভিয়েত [নজরদারি] শাসিত দুঃস্বপ্নের [Distopia] নজির হিসেবে দেখানো হয় যদি; জেসন থেকার-এর *দ্য এজ অব এআই* [২০২০] রামরাজ্য [Utopia] ভাবার সুযোগ নেই। অন্তত বর্তমান মানবতার টিকে থাকা পুরোভাগ ট্রান্সহিউম্যান পর্যায়ে পৌঁছানো পর্যন্ত। এ-বাস্তবতায়, বাংলাদেশের মতো অক্ষশক্তিহীন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলো কতটা প্রস্তুত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবাদী অবাধ-প্রবেশ ও অবাধ-নিয়ন্ত্রণের আগামী পৃথিবীটিকে আরামে গ্রহণ করতে; যার আসল রূপঃ Living in a glass house, looking at the black mirror?[৪৭]

অথচ, দু-দশক আগে থেকেই, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো অক্ষ ক্ষমতার বাইরে পড়ে যাওয়া নানা গোষ্ঠী, নিজেদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় নতুন নতুন নীতি-উদ্যোগ নিয়ে চলেছে।[৪৮] দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, আগত বাস্তবতার কাছে, বাকি পৃথিবীর প্রস্তুতি, অসহায় আত্ম-হস্তান্তরের মতো।

'সাইবার সিকিউরিটি' ধরনের নিরীহ আর্তনাদের মধ্যে এটিকে ভাবার ও দেখার বুদ্ধি খুলতে পারে কারও, এ-পটভূমিতে পড়ে। তবে এটি এখন মানব-সভ্যতার অস্তিত্বের মতো গুরুতর তত্ত্ব-দর্শনের ব্যাপার– যার নেপথ্য রূপকাররা, এখন অব্দি, বিপুল বিশ্ববাসীকে দ্রুততম পুঁজি ও প্রযুক্তি গড়ার কাঁচামাল ছাড়া আর কিছুই ভাবার সুযোগ পাচ্ছে না। পর্যবেক্ষণে ধরে নেয়া যায় – চিন-যুক্তরাষ্ট্র-ইজরাইল-ত্রিশূলে গেঁথে গেছে গোটা বিশ্ব। মেরি শেলি'র [১৭৯৭-১৮৫১] *দ্য মডার্ন প্রমিথিউস* [১৯১৮], বার্ট্রান্ড রাসেলের [১৮৭২-১৯৭০] *ইকারুসঃ দ্য ফিউচার অব সাইন্স* [১৯২৪], জর্জ অরঅয়েলের *নাইন্টিন এইটিফোর* [১৯৪৯] মানুষকে দুঃস্বপ্নই দেখিয়েছিল। তবু বিজ্ঞানের উপর আস্থা রেখেছিল মানুষ। কারণ, বিজ্ঞানের দর্শন বলে, নিরপেক্ষভাবে, বিজ্ঞান মানবসভ্যতার জন্য কল্যাণকর– তার অপব্যবহার ও অপব্যবহারকারীরাই কেবল দুঃস্বপ্নের কারণ। আপাতত তাই, বাঙালি-বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধ্বজার তলে, নয়া-সভ্যতার নয়া মানুষগড়া-প্রকল্পের 'কাঁচামাল' অস্তিত্বটাকে অনুধাবনের সাক্ষরতা অর্জনই প্রথম ও প্রধান কাজঃ চমৎকার স্মার্টপণ্যগুলো আসলে, ব্যবহারকারীর পিছনে লাগিয়ে রাখা একেকটা স্মার্ট গুপ্তচর; তারা কতটা স্মার্ট, তা বেশিরভাগ ব্যবহারকারীরই অজানা – এটুকু সাক্ষরতা।

পরিশেষে, তারপরও, এটা কি চূড়ান্ত করা যাবে যে, পৃথিবীতে বাস করা জাতিরাষ্ট্রগুলোর অন্যতম অংশীজন হিসেবে, বৈশ্বিক প্রযুক্তি-ক্ষমতার যথাযথ হিস্যা ও তার ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার দাবি করে, বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের যৌক্তিক ও জোরালো জাতীয় এজেন্ডার দরকার ও সময় একেবারেই ফুরিয়ে গেছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অঙ্গীকার নিয়ে, জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত রেখে, বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের নিজস্ব সাধ্যের নিজস্ব [পাবলিক-প্রাইভেট?] অন্তর্জাল-ব্যবস্থা [নেটওয়ার্ক সিস্টেম] গড়ে তোলার রূপকল্প নেয়া কি একেবারেই অসম্ভব? যেখানে থাকবে এ-জাতির নিজস্ব আকাশ, নিজস্ব মেঘ [ক্লাউড]। থাকবে, নিজস্ব নিরাপত্তার দুর্ভেদ্য বৈদ্যুতিক-দেয়াল। যেখানে গড়ে উঠবে নিজেদের গড়া শক্তিশালী মেশিন-ইন্টেলিজেন্স; যে-বুদ্ধিমত্তা, জাতিরাষ্ট্রের আগামী প্রজন্মকে নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও নির্দেশনা দেবে। এখন থেকে দু-দশক পর, যেখানে, এ-জাতির নিজস্ব 'ট্রান্স-[পোস্ট]-হিউম্যান' রূপকল্প আকার পেতে শুরু করবে। এমন ভাবনা কি নয়া-ইউটোপিয়ার নামান্তর হবে! এমন স্বপ্নের সাহস ও প্রেরণা তবু তো আসতে পারে – 'জলবায়ুসহ, যে-কোনো বৈশ্বিক মানবিক বিপর্যয়ের সরাসরি ক্ষতির কবলে, এক গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের চরে, ১৮ কোটি জীবন্ত গিনিপিগের বাস' – এমন এক অসহায়ত্বের বোধ থেকে। আগামীর জাতিবিনাশী যুদ্ধেও ময়দানে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে, তার দাঁড়াবার জমিটা শক্ত করে নিতে বলে, এ অসহায়ত্বের বোধ।

আগামী সভ্যতার ছকেঃ স্বায়ত্তশাসন ও ব্যক্তি-অধিকারকে সম্মান করা; বিশ্বের সব মানুষের স্বার্থ ও সম্মানের প্রতি সচেতন থাকা ও একাত্মতা প্রকাশ করা; ভবিষ্যতে টিকে থাকা প্রজন্মের প্রতি নৈতিক দায়গুলো বিবেচনায় রাখা; নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হওয়া– এমন চারটা বলিষ্ঠ শর্ত বা দায় 'বিশ্ব ট্রান্সহিউম্যানিস্ট সংঘ'র ঘোষণাপত্রেই তো আছে। বিশ্ব-প্রযুক্তির কর্তারা [জায়ান্ট!], এড়াবেন কী করে; নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে, নতুন মানবসভ্যতা গড়ার ন্যায়সঙ্গত বিধিমালা?

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. Bostrom, Nick; *The Superintelligent Will: Motivation and Instrumental Rationality in Advanced Artificial Agents*, Minds and Machines, May 2012, p.71-85

২. Kurzweil, Ray; *How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed*, Penguin books. 2013, p.170-78

৩. Schulz, Kathryn; *The Sixth Extinction Examines Human Overkillers and the Next Great die off,* New York Magazine, New York Media, Retrieved February 13, 2014. Access, 20 September, 2020

৪. Kurzweil, Ray; ibid

৫. Harari, Yuval Noah; *21 Lessons for the 21st Century, Talks at Google*, https://www.youtube.com/watch?v=gG6WnMb9Fho, Access, 18 August, 2021

৬. Harari, Yuval Noah, ibid

৭. Kaku,Michio; *The Future of Humanity, Talks at Google*, 9 May 2019, https://www.youtube.com/watch?v=eMxmDPDyQ7o, Last Access, 26 August, 2021

৮. Harari, Yuval Noah; *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*, Vintage,London, 2017, p. 65–76

৯. Seung, Sebastian; *Connectome: how the brain's wiring makes us who we are*, Mariner Books, 2013, p. 273

১০. Nick Bostrom;*A History of Transhumanist Thought, Journal of Evolution and Technology*, Vol. 14, Issue 2005; www.nickbostrom.com, Access 27 August 2020

১১. Nick Bostrom, *A History of Transhumanist Thought*, ibid

১২. Nick Bostrom, ibid

১৩. প্রাক-সক্রেটিস প্রকৃতিবাদী দর্শন-বিজ্ঞান:
[ভূমধ্যসাগরে] গ্রিসের পুব-দিকের দ্বীপ মিলেটাসের থেলিস [৬২৪-৫৪৩ খ্রিস্টপূর্ব], অ্যানাক্সেমেন্ডার [৬১০-৫৪৬ খ্রিস্টপূর্ব], অ্যানাক্সেমেনেস [৫৮৬-৫২৬ খ্রিস্টপূর্ব]; ইলিয়ার পার্মেনিদেস [৫৪০-৪৮০ খ্রিস্টপূর্ব]; এফিসাসের হেরাক্লিটাস [৫৩৫-৪৭৫ খ্রিস্টপূর্ব]; সিসিলির এম্পিডক্লেস [৪৯০-৪৩০ খ্রিস্টপূর্ব]; এশিয়া মাইনরের এনাক্সোগোরাস [৪৯০-৪৩০ খ্রিস্টপূর্ব]; অ্যাবডেরার ডেমোক্রিটাস [৪৬০-৩৭০ খ্রিস্টপূর্ব]; সামোস-এর অ্যারিস্টর্কাস [৩১০-২৩০ খ্রিস্টপূর্ব] এবংগ্রিসের হিপোক্রিটাস [৪৬০-৩৭০ খ্রিস্টপূর্ব]-সহ বহু মনীষীর চিন্তায় পশ্চিমে প্রাকৃতিক-বৈজ্ঞানিক চিন্তার জাগরণ ঘটেছিল। পশ্চিমা জ্ঞানদর্শনে প্রাকৃতিক-বৈজ্ঞানিকতাই যাত্রা করেছিল প্রথম। ভারতীয় জৈন, বৌদ্ধ, চার্বাক দর্শন হয় তার প্রভাবিত নয় তার দ্বারা প্রবাবিত দার্শনিক ঐতিহ্য – প্রায় সমকালের বলে। ভূমধ্যসাগরীয়, এ-বিজ্ঞানী-দার্শনিকগণ প্রে-সক্রেটিক ন্যাচারিলস্টি বলে বেশি সমাদৃত। আমরা লক্ষ করি, পশ্চিমা দর্শনে ভাববাদের লক্ষণ প্রাক-সক্রেটিস গুরুদের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে থাকলেও, তার বুনিয়াদ ও স্থায়িত্ব অ্যাবসলিউট-সন্ধানী সক্রেটিসের হাতে। সক্রেটিসের অ্যাবসলউিট সন্ধান প্লেটোকে 'আইডিয়াল' থেকে অ্যাবসলিউট 'আইডিয়া'র দিকে নিয়ে যায়। মনীষী অ্যারিস্টটল এসে অবজেক্টিভ-ন্যাচারকে মূল্যায়নের নিয়মতান্ত্রিক পাঠপদ্ধতি গড়ে তোলার আগে পর্যন্ত। যদিও রোমান খ্রিস্টবাদের কাজে লেগেছিল সক্রেটিস আর প্লেটোর 'আইডিয়া'। তারপর, দেড় হাজার বছর: অন্ধকার।

১৪. Sorgner, Stefan L; *Nietzsche, the Overhuman, and Transhumanism*, Journal of Evolution and Technology, 20:1, March 2009, p. 29-42.

১৫. Sorgner, Stefan L; ibid.

১৬. Copyright, 1957, by Julian Huxley; Reprinted by permission from Julian Huxley and Harper & Brothers, New York. Originally titled New Bottles for New Wines; reprinted as Mentor Book by arrangement with Harper & Brothers under the title Knowledge, Morality & Destiny. P.73-76

১৭. https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/, Access 8 August 2020

১৮. Naam, Ramez; *More Than Human: Embracing the Promise of Biological Enhancement* Broadway Press, 2005, p.232-234

১৯. Pearce, David; *The Hedonistic Imperative*, Kindle, Newyork, 2015, p.15-25

২০. Moen, OM;*The case for cryonics*, Journal of Medical Ethics, August 2015, p.493–503

২১. More, Max;*The Overhuman in the Transhuman*, Journal of Evolution and Technology, January 2010, p.1-4

২২. Harari, Yuval Noah; *Homo Deus*, 2017, ibid

২৩. Kicker, Darrell;*Bell, Wendell and Oliver W. Markley; Two Futurists' Views of the Preferable, the Possible and the Probable*, Journal of Futures Studies, February 2009, p.161-178

২৪. বৈজ্ঞানিক কল্পকথা ও ছবি:
নাম করা যায়: লুইসা হল-এর স্পিক [২০১৫]; কারেল কাপেক-এর 'আর.ইউ.আর' [২০২১]; ডোমিনিক পেরিসিয়েন এবং নাভাহ উলফ সম্পাদিত 'রোবট ভার্সেস ফেইরিজ' [২০১৮]; ডেনিস ই. টেইলর এর 'উই আর লেজিয়ন' [২০১৬]; বেকি চেম্বার্স-এর 'আ ক্লোজড অ্যান্ড কমন অরবিট' [২০১৬]; ই. এম. ফোনার-এর 'ডেট নাইট অন ইউনিয়ন স্টেশন' [২০১৪]; জন সি. ওাইট-এর 'দ্য গোল্ডেন এজ' [২০০২]; ড্যানিয়েল এইচ. উইলসন-এর 'রোবোক্যালিপ্স' [২০১১]; গ্রেগ বিয়ার-এর 'কুইন অব এ্যাঞ্জেলস্' [১৯৯০]; ড্যানিয়েল সুয়ারেজ-এর 'ডেমন' [২০০৬]; অ্যান লেকি-এর 'এনসিলারি জাস্টিস' [২০১৩]; অ্যালেস্টেয়ার রেনল্ডস্-এর 'হাউজ অব সান' [২০০৮]; টেড চিয়াং-এর 'দ্য লাইফ সাইকল অব সফটওয়্যার অবজেক্টস্' [২০১০]; মার্থা অয়েল্স-এর 'অল সিস্টেমস্ রেড' [২০১৭]; নেল স্টেফেন্সন-এর 'দ্য ডায়মন্ড অ্যাজ' [১৯৯৫]; উইলিয়াম গিবসন-এর 'নিউ রোমান্সার' [১৯৮৪]; রবার্ট এ. হেইনলেইন-এর 'দ্য মুন ইজ আ হার্শ মিসট্রেস' [১৯৬৬]; আইজাক আসিমভ-এর 'আই, রোবট' [১৯৫০]; হারলেন এলিসন-এর 'আই হ্যাভ নো মাউথ অ্যান্ড আই মাস্ট স্ক্রিম' [১৯৬৭]; ইয়ান অ্যাম. ব্যাংকস্-এর 'অ্যাক্সেশন' [১৯৯৬]; রুডি রাকার-এর 'ওয়্যার টেট্রালজি' [১৯৮২]; ড্যান সিমোন্স-এর 'হাইপেরিয়ন' [১৯৮৯]; চার্লস স্ট্রস-এর 'এক্সিলারেন্ডো' [২০০৫]; আর্থার সি ক্লার্ক-এর '২০০১ স্পেস ওডেসি' [১৯৬৮]; ওলাফ স্টাপলেডন-এর 'লাস্ট অ্যান্ড ফার্স্ট ম্যান: আ স্টোরি অব দ্য নিয়ার অ্যান্ড ফার ফিউচার' [১৯৩০]-সহ অনেক গল্প।

আবার এসব 'বেস্ট সেলার' বৈজ্ঞনিক কল্পকাহিনির পাশাপাশি 'বেস্ট ওয়াচ্ড' বৈজ্ঞানিক কল্পছবির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে:

মাস্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড [১৯৩৪: জার্মানি], দ্য ডে দ্য আর্থ স্টুড স্টিল-১ ও ২ [১৯৫১, ২০০৮: ইউএসএ], আলফাবিল [১৯৬৫: ফ্রান্স], কলোসাস দ্য ফরবিন প্রজেক্ট [১৯৭০: ইউএসএ], সাইলেন্ট রানিং [১৯৭৭: ইউএসএ], ওয়েস্ট ওয়ার্ল্ড [১৯৭৩: ইউএসএ], ডেমন সীড [১৯৭৭: ইউএসএ], এলিয়েন [১৯৭৯: ইউএসএ], স্যাটার্ন থ্রি [১৯৮০: ইউকে], ব্লেড রানার-১ ও ২ [১৯৮০: ইউএসএ], এয়ারপ্লেন-২, ওয়ার গেমস্ [১৯৮৩: ইউএসএ], ইলেক্ট্রিক ড্রিমস্ [১৯৮৩: ইউএসএ, ইউকে], হাইড অ্যানড সিক [১৯৮৪: কানাডা], শর্ট সার্কিট-১ ও ২ [১৯৮৬, ১৯৮৭: ইউএসএ], রোবোকপ [১৯৮৭: ইউএসএ], ব্লাঙ্ক ম্যান [১৯৯৪: ইউএসএ], গোস্ট ইন দ্য শেল [১৯৯৪: জাপান], মাইটি মরফিন পাওয়ার রেঞ্জারস্ [১৯৯৫: ইউএসএ], অস্টিন পাওয়ারস্: ইন্টারন্যাশনাল ডে অব মিস্ট্রি [১৯৯৬: ইউএসএ], নির্ভানা [১৯৯৭: ইটালি-ফ্রান্স], দ্য আইরন জায়ান্ট [১৯৯৭: ইউএসএ], বাইসেন্টিনিয়াল ম্যান [১৯৯৯: ইউএসএ], সিমোন [ইউএসএ], আই, রোবট [২০০৪: ইউএসএ], দ্য হিচিকার্স গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি [২০০৪: ইউএসএ], স্টিলথ [২০০৫: ইউএসএ], মিট দ্য রবিনসন্স [২০০৭: ইউএসএ],

ঈগল আই [২০০৭: ইউএসএ], আইরন ম্যান [২০০৭: ইউএসএ], মুন [২০০৯: ইউকে], এ্যানথিরান [২০১০: ভারত], ইভা [২০১০: স্পেন, সুইজারল্যান্ড], রিয়াল স্টিল [২০১১: ইউএসএ], রা-১ [২০১১: ভারত], প্রমিথিউস [২০১১: ইউএসএ], রোবট অ্যান্ড ফ্রান্ক [২০১২: ইউএসএ] টোটাল রিকল [২০১২: ইউএসএ] হার [২০১২: ইউএসএ], দ্য মেশিন [২০১২: ইউকে], প্যাসিফিক রিম [২০১৩: ইউএসএ] অবলিভিয়ন [২০১৩: ইউএসএ], অটোম্যাটা [২০১৩: স্পেন-বুলগেরিয়া], ইন্টারস্টেলার [২০১৩: ইউএসএ], ট্রান্সেন্ডেন্স [২০১৪: ইউএসএ], এক্স মেশিনা [২০১৪: ইউএসএ], চ্যাপি [২০১৪: ইউএসএ], টুমরোল্যান্ড [২০১৪: ইউএসএ], আনকেনি [২০১৫: ইউএসএ], সাইকো পাস: দ্য মুভি [২০১৫: জাপান], ম্যাক্স স্টিল [২০১৫: ইউএসএ], মরগান [২০১৫: ইউএসএ], ইনফিনিটি চ্যাম্বার [২০১৬: ইউএসএ], কিল কমান্ড [১৯৮২: ইউকে], এলিয়েন [২০১৭: ইউএসএ], কভেনান্ট [২০১৭: ইউএসএ], আপগ্রেড [২০১৭: অস্ট্রেলিয়া], তাউ [২০১৭: ইউএসএ], ২৩৬ অরিজিন আননোন [২০১৭: ইউকে], এক্সটিংশন [২০১৮: ইউএসএ], ম্যানিয়াক [২০১৮: ইউএসএ], ২.০ [২০১৮: ভারত], এ.এক্স.এল [২০১৮: ইউএসএ], এ.আই রাইজিং [২০১৮: ইউএসএ], রেপ্লিকাস [২০১৮: ইউএসএ], সেরেনিটি [২০১৮: ইউএসএ], হাই এ.আই [২০১৮: জার্মানি], ক্যাপ্টেন মার্বেল [২০১৮: ইউএসএ], দ্য ওয়ান্ডারিং আর্থ [২০১৯: চায়না], আই অ্যাম মাদার [২০১৯: ইউএস-অস্ট্রেলিয়া], হিউম্যান [২০১৯: নরওয়ে], মেশিন [২০১৯: অস্ট্রেলিয়া], ব্লাড মেশিনস্ [২০১৯: ফ্রান্স], সুপার ইন্টেলিজেন্স [২০২০: ইউএসএ] – ছাড়াও টারিমিনেটর, স্টার ওয়ার্স, স্টার ট্রেক, মেট্রিক্স, রেসিডেন্ট ইভিল [ইউকে-জার্মানি], এক্স ম্যান সিরিজের ছবিগুলো উল্লেখযোগ্য।

২৫. Harari, Yuval Noah; *21 Lessons for the 21st Century, Talks at Google*, ibid

২৬. হকিং, স্টিফেন; *গ্র্যান্ড জিাইন, দুনিয়াটা কি সৃষ্টিকর্তা বানিয়েছেন?, জীবনের মানে, বিশ্বলোকের চাবি*; ভূমিকা ও রূপান্তর: মোজাহার, সেলিম; বুকিশ পাবলিকেসন্স, ঢাকা, ২০২১, পৃ.৩৫-৫৯

২৭. More, Max; *Transhumanism: towards a futurist philosophy,* Extropy 6 (summer), 1990, p.6-12

২৮. Bostrom, Nick; *Astronomical Waste: The Opportunity Cost of Delayed Technological Development*, Utilitas, 15:3, 2003b, p.308-314

২৯. Stock,Gregory; *From Regenerative Medicine to Human Design: What Are We Really Afraid Of?* DNA and Cell Biology, 22 (11), 2006, p.679–683

৩০. Bostrom, Nick; *Are you living in a computer simulation?* Philosophical Quarterly, 53:211, 2003, p.243-255

৩১. Kaku,Michio; *The Future of Humanity, Talks at Google*, 9 May 2019, https://www.youtube.com/watch?v=eMxmDPDyQ7o, Access, 26 August, 2021

৩২. বিস্তারিত দেখুন: মিচিও কাকু'র*ভিশন অব দ্য ফিউচার* [২০০৭]*ফিজিক্স অব দ্য ইমপোজিবল* [২০০৮], *ফিজিক্স অব দ্য ফিউচার* [২০১১] এবং *দ্য ফিউচার অব দ্য মাইন্ড* [২০১৪]।

৩৩. Bostrom, Nick; Minds and Machines, *The Superintelligent Will: Motivation and Instrumental Rationality in Advanced Artificial Agents*. May 2012, p.71-85

৩৪. ফিউচারিস্ট রে কুর্জওয়েলকে একটু আলাদা করেই চেনা যাক:
প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানজগতে ৩০ বছরের নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণীর অভিজ্ঞতা ও সাফল্যঋদ্ধ বিশ্বখ্যাত আমেরিকান আবিষ্কারক, চিন্তাবিদ ও ভবিষ্যবাদী বিজ্ঞানীরে কুর্জওয়েল। নিরলস, বিরামহীন প্রতিভা হিসেবে তাকে মূল্যায়ন করা হয়। ১৬ জন নির্বাচিত আমেরিকান বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের মধ্যে কুর্জওয়েল অন্যতম – যারা আমেরিকান-সভ্যতা গড়ে তুলেছেন। তার পাওয়া অনেক পুরস্কার-স্বীকৃতি-সম্মানের ভিতর 'সংগীতপ্রকৌশল'-এর জন্যে পাওয়া 'গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড' অন্যতম। আমেরিকার 'ন্যাশনাল ইনভেস্টর্স হল অব ফেইম'-এর কাছ থেকে পাওয়া 'ন্যাশনাল মেডেল অব টেকনোলজি'-সহ ২১টি ডক্টরেট ডিগ্রি তার ঝুলিতে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। আমেরিকার তিন-তিন জন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে তিনি বিশেষ সম্মাননা পান। ভবিষ্যবাদী বিজ্ঞানী রে-কুর্জওয়েল গোঁড়া ট্রান্সহিউম্যানিস্টদের অন্যতম।

৩৫. Kurzweil, Ray; *How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed*, Penguin books, 2013, p. 178

৩৬. Minsky, Marvin; *The Emotion Machine*, Simon & Schuster, 2006, p.15-25

৩৭. *AlphaGo, 2020*, Film Duration: 1:30.27 Second, Directed by Greg Kohs, Scored by Academy Award nominee Hauschka, https://www.youtube.com/watch?v= WXuK6gekU1Y, Access, 22 August, 2021.

৩৮. AlphaGo, ibid

৩৯. AlphaGo, ibid

৪০. *A Dying Culture*, [Documentary Film, Duration 3:45 Minute], Made by friends and Comrade of Prolekult Society.

The feature-length Marxist documentary looking at culture, art, postmodernism, video games, data, social media, the state and war in context of the largest crisis in capitalism's history.

https://www.youtube.com/watch?v=-jLbq9VwOK8, Access: 25 July 2020.

৪১. *A Dying Culture*, ibid.

৪২. Juboff, Shoshana; *At the Age of Surveillance Capitalism*, Profile Books, January 2029, p.15-35.

৪৩. Juboff, Shoshana; *Digital feudalism: The future of data capitalism*, UCL Institute for Innovation and Public Purpose, July 2021, https://www.youtube.com/watch?v= fKgPQSa1_0o, Access 20 August 2021.

৪৪. Harari, Yuval Noah; *21 Lessons for the 21st Century, Talks at Google*, ibid.

৪৫. *Circle*, Directed by James Ponsoldt, February 2017, Film Duration 1.51 Minute, STXfilms and EuropaCorp.

৪৬. Harari, Yuval Noah; *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*, California University of Television (UCTV), https://www.youtube.com/watch?v=4ChHc5jhZxs, Access, 22 August 2021.

৪৭. Note: *Black Mirror* TV Series, Main Writer-Director: Charlie Brooker, 2011-2019. Won 6 Primetime Emmys, 33 wins & 107 nominations total. An anthology series exploring a twisred, high-tech, multiverse whwre humanity's greatest innovations and darkest instincts collide.

৪৮. https://gdpr-info.eu/, *Transparency and modalities*, Access, 24 August 2021.